ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের গুণাবলী

শেখ মুহাম্মাদ ফজলে বারী মাসউদ

প্রকাশনায়
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন
কেন্দ্রীয় কার্যালয়
৫৫/বি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৫৭১৩১

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০১১ ইং

নির্ধারিত মূল্য : ১২ (বার) টাকা মাত্র

ISLAMI ANDOLANER DAITTOSHILDER GUNABALI
By- Sheikh Md. Fazley Bari Masud
Published by I.S.C.A Publications
55/B Purana Paltan (2nd Floor), Dhaka- 1000
Fixed Price - Taka 12.00 Only

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম

সারা জাহানের মালিক মহান আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দীন হল ইসলাম। এ ইসলামকে তাঁর জমিনে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুগে যুগে তিনি পাঠিয়েছিলেন আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণকে। তারা এ দীনকে জগতবাসীর সামনে, সকল মতবাদ, ধর্ম, মত ইত্যাদির সামনে শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জগতের স্রষ্টা নির্দেশিত পথে আহবান করে গেছেন। আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণই এ আন্দোলনের অগ্রসেনানী হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন সারা আলমে। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে–

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

অর্থাৎ, তিনি সেই আল্লাহ যিনি তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সত্য দীন দিয়ে, যেন তিনি অপরাপর সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলামকে বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। (সূরা আস-সফ : ৯)

যুগে যুগে আগত এসব নবী রাসূলগণ ছিলেন জগতের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁরাই ছিলেন স্ব-স্ব যামানার সর্বাধিক যোগ্য। কাজেই এখনও আমরা যারা আম্বিয়া আ. এর উত্তরসূরি হিসেবে তাদের রেখে যাওয়া কাজে নেতৃত্বদানের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হতে চাই, তাদেরকেও সমকালীন সকল যোগ্যতার মাপকাঠিতে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে।

এক্ষেত্রে ঈমানের মজবুতি, নিয়তের সঠিকতা এবং খুলুসিয়াতের পূর্ণতার সাথে সাথে দায়িত্বশীলকে মৌলিক বেশ কিছু গুণাবলী অর্জন করা প্রয়োজন। নিম্নে অতীব প্রয়োজনীয় কিছু গুণ আলোচনা করা হল। কুরআন সুন্নাহর আলোকে আলোচিত এসব গুণ ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি দায়িত্বশীলের জন্য অর্জন করা একান্ত জরুরী।

১. জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা :

ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি দায়িত্বশীলকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। এটি করতে হবে মৌলিকভাবে দুটি কারণে–

প্রথমত : মহান আল্লাহর ঘোষণা–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, হে নবী আপনি বলে দিন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? (সূরা ঝুমার : ০৯)

না, কোন ক্ষেত্রেই সমান হতে পারে না। অতএব দায়িত্বশীলকে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ বা উত্তমদের কাতারে শামিল হতে হবে।

দ্বিতীয়ত : একজন দায়িত্বশীলকে সাধারণত দু'ধরণের কাজ করতে হয়।

এক. নিজ সংগঠনের আদর্শ বা ইসলামের সুমহান আদর্শকে অন্যের সামনে হেকমতপূর্ণ ভাষায়, সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা।

দুই. যারা এ আদর্শের বিরোধিতা করে কিংবা যেসব মতাদর্শের সাথে বিতর্ক সৃষ্টি হয়, তাদেরকে সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় বুঝিয়ে দেয়া।

কুরআন মাজীদের ভাষায়–

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

অর্থাৎ, হে নবী! আপনি লোকদেরকে আপনার প্রভূর পথে প্রজ্ঞাপূর্ণ, উত্তম উপদেশ এবং সুন্দর যুক্তির মাধ্যমে আহবান করুন। (সূরা নাহল: ১২৫)

দায়িত্বশীলকে এ মৌলিক কাজ দুটি করতে হলে জ্ঞানের জগতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। তার মাঝে থাকতে হবে জ্ঞানসাগর মন্থন করার অনন্ত পিপাসা এবং অজানাকে জানার গভীর অনুসন্ধিৎসা।

এক্ষেত্রে সাংগঠনিক জীবনে দায়িত্বশীলকে নিম্নের বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ জ্ঞানার্জন করতে হবে–

ক. ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান :

আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এবং রাসূল সা. নির্দেশিত যে আদর্শ বা বিধানাবলী প্রতিষ্ঠা করতে চাই, সে ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। যে পথে অন্যদেরকে অহবান করব, আন্দোলন সংগ্রাম তথা সর্বোচ্চ কুরবানীর মাধ্যমে যা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, সে সম্পর্কে তো

প্রথমে নিজেকেই পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানার্জন করতে হবে। যে সম্পর্কে জানা নেই, তা প্রতিষ্ঠা করা কিভাবে সম্ভব? এক অন্ধ আরেক অন্ধকে কিভাবে পথ দেখাতে পারে?

কাজেই দায়িত্বশীলকে ইসলামী আকীদা, ইবাদতের পথ ও পদ্ধতি, ইসলামের সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, জীবন চলার পথের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে ভাসা-ভাসা জ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিপথগামী হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন– وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আনুমানিক (ভাসা-ভাসা) জ্ঞান সত্যের ক্ষেত্রে কোন উপকারে আসে না। (সূরা নাজম : ২৮)

কাজেই ভাসা ভাসা জ্ঞান দিয়ে সত্যের পথে চলা যায় না। কাজেই প্রচলিত অন্যান্য মতবাদের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ও যৌক্তিকতা সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে। এছাড়াও তাফসীর, হাদীসশাস্ত্র এবং উলূমুল কুরআন, উসূলে হাদীস, উসূলে ফেকাহ সম্পর্কে কমপক্ষে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করা একান্ত জরুরী।

খ. নিজ পেশা বা কাজ সংক্রান্ত সার্বিক জ্ঞান :

একজন দায়িত্বশীল ছাত্রকে ক্লাসের অন্য দশজনের চেয়ে পাঠ্যপুস্তক থেকে অধিক জ্ঞানার্জন করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক অন্যদের মত কেবল সাধারণভাবে অধ্যয়ন করলেই চলবে না বরং তার আদর্শের পক্ষে যা কিছু পাওয়া যায় তা যথাযথভাবে আত্মস্থ করা চাই। তার সংগঠনের আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় এ পাঠ্য বইয়ের জ্ঞানকে সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর জন্য এর যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে। দায়িত্বশীল অন্য কোন পেশার হলে তার সে পেশা যেন দীন বিজয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে সে উদ্দেশ্যকে সামনে রাখতে হবে। সে জন্য নিজ পেশা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

যেমন: নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে সকল আম্বিয়া আ. কে দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা মেষ চড়িয়েছেন। এলোমেলো চলাফেরায় অভ্যস্ত, প্রচন্ড জিদ ওয়ালা এ প্রাণীকে চড়াতে গিয়ে তাঁরা দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ছিলেন। পরবর্তীতে শতধা বিভক্ত মানবজাতিকে দীনের পথে পরিচালনার জন্য এ দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অতএব দায়িত্বশীলকে ব্যক্তিগত পেশায় এবং কঠিন থেকে কঠিন কাজেও সফল হতে হবে।

গ.আরবী ভাষা জ্ঞান :

পবিত্র কুরআন, হাদীস সহ ইসলামের মৌলিক গ্রন্থগুলো আরবী ভাষায়। দায়িত্বশীল যেন বিভ্রান্তিতে না পড়ে কিংবা কেউ যেন তাকে বিভ্রান্তিতে ফেলতে না পারে সে জন্য আরবী ভাষায় কমপক্ষে নূন্যতম পারদর্শী হতে হবে। রাসূল স. এরশাদ করেছেন " أُحِبُّ الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ : لِأَنِّيْ عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنَ عَرَبِيٌّ وَكَلَامَ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ " অর্থাৎ- আরবী ভাষাকে আমি তিন কারণে ভালবাসি, এক: আমি আরবী ভাষী, দুই : পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবী, তিন : জান্নাতবাসীদের ভাষা আরবী (তবরানী, আল-হাকীম, বায়হাকী)

ঘ. ইসলামের স্বর্ণালী যুগের ইতিহাস :

শত বাঁধা-বিপত্তি ও সংকট মুহূর্তেও নিজ আদর্শ বা কর্মক্ষেত্রে অটল অবিচল থাকতে পূর্বসূরীদের ইতিহাস গূরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিজ কর্মস্পৃহা বৃদ্ধিতে গৌরবান্বিত ইতিহাস নীরব পরিচালকের কাজ করে থাকে। আমাদের প্রিয় রাসূলকে স. সান্তনা প্রদান, কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি, কর্মপন্থা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা কালামে পাকের বিভিন্ন জায়গায় অতীতের নানা ঘটনা ও ইতিহাস উল্লেখ করেছেন। অতঃপর এভাবে রাসূল স. কে বলেছেন : فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ অর্থাৎ- হে নবী আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন যেভাবে করেছিলেন পূর্ববর্তী দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাসূলগণ আ. এবং এসব কাফের মুশরেকদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। (সূরা আহক্বাফ: ৩৫)

এ রকম অসংখ্য আয়াতে কারীমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা ইতিহাসের নানা ঘটনাবলী তাঁর প্রিয় রাসূল স. কে শিক্ষা দিয়েছেন। যা কিনা দীন বিজয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আন্দোলনে রাসুল স. কে নানাভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁর পদক্ষেপগুলোকে করেছে অসম্ভব মজবুত ।

এজন্য একজন দায়িত্বশীলকে অবশ্যই অতীতের আম্বিয়াদের আ. ইতিহাস, আমাদের প্রিয় রাসূল স. ও সাহাবায়ে কেরামের সমুজ্জল, সমুদ্ভাসিত জীবন চরিত গভীর ভাবে অধ্যয়ন করতে হবে । জানতে হবে খোলাফায়ে রাশেদীন সহ যুগে যুগে ইসলামের স্বর্ণালী ইতিহাসগুলো। একই সাথে মুসলমানদের পদস্খলন ও খেলাফতের পতনের কারণ ও এ সম্পর্কীত যাবতীয় ঘটনাবলী এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। খুব সতর্কতার সাথে সত্যকে যথাযথভাবে জেনে নিতে হবে।

এসব জ্ঞান একজন দায়িত্বশীলের পথচলাকে করে সুদৃঢ় ও পদস্খলন মুক্ত এবং তখন ইসলামী আন্দোলনে দূরারোগ্য ক্যান্সার তুল্য "হতাশা" তাকে আদৌ স্পর্শ করতে পারবে না।

ঙ. অন্যান্য বিপ্লবের ইতিহাস :

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত নানা বিপ্লবের সামগ্রিক ইতিহাস দায়িত্বশীলকে জানার চেষ্টা করতে হবে। এসব বিপ্লবের লক্ষ্য, টার্গেট ও ফলাফলের সাথে ইসলামের আদৌ কোন সর্ম্পক থাক চাই না থাক। বৈষয়িক যে কোন বিপ্লব থেকেও শিক্ষনীয় বিষয়াবলী গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন: রুশ বিপ্লব ও সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন, ইরান বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব ও তৎকালীন বিশ্ব পাশাপাশি আরব জাহানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইতিহাস ইত্যাদি।

চ. চলমান দেশ ও আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ (রাজনৈতিক ও অন্যান্য):

দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক অন্যান্য ঘটনা প্রবাহের উপর একজন দায়িত্বশীলকে নিয়মিত নজর রাখতে হবে। এক্ষেত্রে জনসাধারণের

চেয়ে দায়িত্বশীলকে যত্নবান ও অগ্রগামী হতে হবে। সঠিক ও দ্রুত তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধিক পত্রিকা পড়া যেতে পারে। ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ নানা প্রযুক্তির সহায়তা নেয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার দোহাই দিয়ে ইসলাম স্বীকৃত নয় এমন পন্থা কখনই অবলম্বন করা যাবে না।

ছ. বিজ্ঞানের নব নব আবিস্কার সম্পর্কিত জ্ঞান :

বিজ্ঞানের নব নব আবিস্কার ইসলামের বিজয়ের পথে মূখ্য সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলামের প্রচার -প্রসার এবং এর চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবাধ ও সর্বোচ্চ ব্যবহার জানতে হবে এবং তা প্রয়োগ করতে হবে। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় মুসলমানদের হারানো নেতৃত্ব পূনরুদ্ধারের মানসিকতা নিয়ে দায়িত্বশীলকে কাজ করতে হবে। ইসলাম এ বিষয়টিতে বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করেছে। যেমন: কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে : الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا অর্থাৎ- যারা দাড়িয়ে, বসে ও শয়ন অবস্থায় আল্লাহ পাকের জিকির করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে এসব কিছুই আপনি বৃথা সৃষ্টি করেননি.... (এরাই হল বুদ্ধিমান)। (সূরা আল ইমরান: ১৯১)

তবে একথা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে ইসলামের বিজয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। আমাদের সকল কাজে আস্থা-বিশ্বাস ও ঈমান একমাত্র মহান আল্লাহর তায়া'লার উপর রাখতে হবে।

জ. মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান :

عِلْمُ النَّفْسِ বা মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান দায়িত্বশীলকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে। কর্মীদের বাচনভঙ্গি, আচার-আচরণ, দৃষ্টি, চেহারার মলিনতা কিংবা হাস্যজ্জলতা, গতি-প্রকৃতি, শিষ্টাচার ইত্যাদি দেখে দায়িত্বশীলকে কর্মীদের রোগ বা সমস্যা নির্ণয় করতে হয়। তাদের

প্রত্যাশা ও চাহিদা দেখে তা পূরণ কিংবা তার অযৌক্তিকতা বুঝিয়ে দিতে হয়। মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান এসব ক্ষেত্রে তাকে ব্যাপক সহযোগিতা করতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলকে প্রচন্ড ধীশক্তি ও দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। কোনক্রমেই তালগোল পাকিয়ে ফেলা যাবে না। মাদ'উ (যাকে দা'ওয়াত দেয়া হয়) এর যথাযথ অবস্থা বুঝে সংগঠনের দা'ওয়াত উপস্থাপনের জন্য দা'ঈর এ জ্ঞান অতীব জরুরী। দায়িত্বশীল হিসেবে সংগঠনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

এছাড়া সভ্যতা সংস্কৃতিসহ জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য যত ধরণের জ্ঞানের প্রয়োজন তা অর্জনে দায়িত্বশীলকে একনিষ্ঠ ও যত্নবান হতে হবে । প্রচলিত ও সাধারণ বিষয়াদি ছাড়াও প্রতিটি বিষয়ের সূক্ষ্ণ ও মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। নিজ সংগঠন ও ইসলাম বিরোধীদের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার মত জ্ঞান থাকতে হবে। তাদের সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেয়ার মত যোগ্যতা, জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও গভীরতা থাকা একজন দায়িত্বশীলের জন্য একান্ত আবশ্যক।

২. পরিশুদ্ধ আত্মা ও উন্নত আমলের অধিকারী হওয়া :

ক: সকল কাজের সফলতা-কিংবা ব্যর্থতা নির্ভর করে আত্মার পরিশুদ্ধিতার উপর:

আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا . অর্থাৎ: যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করল সে সফলকাম আর যে আত্মাকে কলুষিত করল সে ব্যর্থ হল। (সূরা আশ্‌শামস: ৯-১০)

রাসূল স. ঘোষণা করেন: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّه اَلْمُؤَلِّفُ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى مِنْ حَدِيْثٍ: إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَ هِيَ الْقَلْبُ অর্থাৎ: মানবদেহে অবধারিতভাবে এক টুকরো গোশ্‌ত রয়েছে, যখন সেটি পরিশুদ্ধ হয় তার সব কিছুই পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। আর যখন তা কলুষিত হয় তখন

তার সব কিছুই কলুষিত, বিপথগামী ও বিনষ্ট হয়ে যায়। (শরহু রিসালাতে কিতাবুল ঈমান, আবু উবায়দুল্লাহ বিন সালাম, ১ম খ: পৃ: ১৫৯)

অতএব, একজন দায়িত্বশীলের আত্মা যখন পরিশুদ্ধ হবে তখন দুনিয়া ও আখেরাতের সব সফলতা তার দ্বারস্থ হবে। তার সকল কার্যক্রম হবে সুন্দর, গোছালো, পরিপাটি, নিয়মতান্ত্রিক, ঝঞ্ঝা ও সমস্যামুক্ত, নির্ভেজাল। দীনেরতরে একনিষ্ঠকর্মী বাহিনীর কাছে গ্রহণযোগ্য। দীন বিজয়ের পথে সহায়ক। মোটকথা তার সবই হবে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী।

অপরদিকে যার আত্মা পরিশুদ্ধ হবে না তার সকল কার্যক্রম হবে উপর্যুক্ত গুণাবলীর বিপরীত। সব সমস্যা ও বিশৃঙ্খলার মূল উৎস হবে সে। যা কখনই কারো কাম্য নয়।

খ. উন্নত আমল:

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের আমল হতে হবে সর্বোন্নত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে নির্দেশনা দিয়ে বলেন: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

অর্থাৎ- আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ডাকাডাকি করে এবং যারা পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে আপনি তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না।

যার মনকে আমার জিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। (সূরা কাহাফ: ২৮)

উল্লেখিত এ আয়াতে কারীমায় স্পষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বশীলকে অবশ্যই দুনিয়াবিমুখ হতে হবে, সর্বদা জবানে আল্লাহ পাকের জিকির

জারি রাখা এবং মহান রবের দরবারে নিজেকে পুরোপুরিভাবে সঁপে দিতে হবে।

তাকে নেকআমলের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহনের মাধ্যমে নিজের ঈমানকে পাহাড়সম মজবুত ও দৃঢ় করতে হবে। কেননা ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদের ময়দানে একজন দায়িত্বশীলকে প্রতিনিয়ত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। জালীমশাহীর চোখ রাঙ্গানী, বুলেট, জীবনের উপর হুমকি, জেল, জুলুম, লোভ, হতাশা, বিশৃঙ্খলা, চাহিদা পূরণের চরম লালসা ইত্যাদি এ ময়দানে নিত্য সময়ের সাথী। ঈমান ও আমলের নিখুঁত মজবুতি ও সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছতে সক্ষম নাহলে এসব পরীক্ষায় দায়িত্বশীল অকৃতকার্য হবে। দীনের মহান দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সে মোটেই নিরাপদ থাকবে না। যে কোন সময় তার পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। যে কোন সময় তার দ্বারা দীনের বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। হতে পারে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন:

اتَّبِعُوا مَنْ لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ অর্থাৎ- তোমরা ঐসব ব্যক্তির অনুসরণ কর যারা তোমাদের কাছে প্রতিদান কামনা করে না এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্ত । (সূরা ইয়াসিন : ২১)

এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা দায়িত্বশীলদেরকে হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। এটা অর্জিত হতে পারে ঈমানী মজবুতি ও উন্নত আমলের মাধ্যমে। এজন্য দায়িত্বশীলকে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতের পাশাপাশি নফল বা মুস্তাহাবের প্রতিও যত্নবান হতে হবে । আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا অর্থাৎ: (রাতের শেষ ভাগে) তাদের পার্শ্ব সমুহ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং পালনকর্তার আযাবের ভয়ে ও রহমতের আশায় তাকে ডাকাডাকি করতে থাকে। (সূরা সেজদাহ:১৬)

নব জাগরণের কবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন: অর্থাৎ- তুমি ফরিদ উদ্দীন আত্তার, ইমাম রাজি ও ইমাম গাযালীর নামে নাম রাখতে পার, জেনে রাখ কিছুই তোমার অর্জিত হবে না শেষ রাতের আহাজারী ছাড়া।

এসব নেকআমলের পাশাপাশি নিষিদ্ধ কোন কাজের ধারেকাছেও যাওয়া যাবে না। মাকরূহে তাহরীমি এমনকি মাকরূহে তানযীহি থেকেও বিরত থাকতে হবে। কথা ও কাজের মধ্যে থাকতে হবে অসাধারণ মিল। নিফাক এর সকল আলামত থেকে সর্বোচ্চ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। সন্দেহমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। পর্দা ও চক্ষুর হেফাজতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ এসব গুণাবলীর বিপরীত আচরণের ফলে অন্তর ও চোখের নূর চলে যায়। ইবাদত তথা ইসলামী আন্দোলনের প্রতি আগ্রহ ও মজা অন্তর থেকে চলে যায়। একারণেও কখনও কখনও দায়িত্বশীলকে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়। দায়িত্বশীলের আমলের ত্রুটি তার দা'ওয়াতী কাজের ক্ষেত্রেও প্রচন্ড ভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে। চক্ষুর হেফাজত সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ অর্থাৎ: আল্লাহ তা'য়ালা চোখের খেয়ানত বা লুকোচুরি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (সূরা মুমীন: ১৯)

গ. আমলের সার্বিক উন্নতির জন্য একজন হক্কানী পীরের হাতে বায়াত গ্রহণ করা দায়িত্বশীলের জন্য অতীব জরুরী। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ অর্থাৎ: হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নেককার বান্দাদের সহচার্য গ্রহণ কর। (সূরা তাওবা: ১১৯)

সতর্কতার বিষয় হল: নিজ সংগঠনের আমীর যদি হক্কানী পীর হন তবে অন্য কোন পীরের হাতে বায়াত হওয়া যাবে না। বরং নিজ সংগঠনের আমীরের হাতে বায়াত গ্রহণ করতে হবে। কেননা সংগঠনের আমীর ও তরীকতের আমীরের নির্দেশনার মধ্যে যদি কোন সময় বৈপরিত্ত্ব দেখা দেয় সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই একজনকে অমান্য করতে হবে যেটা পুরাপুরি

আনুগত্যহীনতা যা কিনা ওয়াজিব তরকের শামীল। অতএব, বুঝে শুনে কোন দায়িত্বশীল এ দ্বৈতনীতি গ্রহণ করতে পারে না।

৩. সাংগঠনিক দক্ষতা :

সাংগঠনিক জীবনে 'দক্ষতা' একটি অপরিহার্য বিষয়। দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হলে সংগঠন যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হবে ব্যক্তিগতভাবেও লাঞ্চিত হতে হবে প্রতিটি পদে পদে। অদক্ষ ব্যক্তি নেতৃত্বের আসনে অধিষ্টিত হলে সংগঠনে বিশৃঙ্খলা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। কারণ সে সংগঠন নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম হয় না। এরা বিশৃঙ্খলা দূর করতে তো জানেই না বরং নিজেরাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে প্রতিনিয়ত। অদক্ষ নেতৃত্বের কারণে সাজানো গোছানে, সু-শৃংখল একটি প্রতিষ্ঠান, একটি সংগঠন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে খুব সহজেই। অযোগ্য ও অদক্ষ নেতৃত্বের প্রতি যেমন কেউ আস্থা রাখতে পারে না, ঠিক একইভাবে সংগঠনও তাদের কারণে সকলের আস্থা হারায়। এজন্য অযোগ্য ও অদক্ষ নেতৃত্ব সংগঠনের জন্য মারাত্বক ক্ষতিকর। রাসূল স. ঘোষণা করেন: إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ অর্থাৎ-যখন অযোগ্য ব্যক্তিদেরকে তোমাদের নেতৃস্থানীয় করা হবে তখন তোমরা কেয়ামতের অপেক্ষা করতে থাক। (বুখারী শরীফ)। কাজেই নেতৃত্বকে অবশ্যই দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

মনে রাখার বিষয় হল : মানুষ কিন্তু দক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে না বরং দেখে, শুনে, কাজ করতে করতে দক্ষতা অর্জন করে। তবে এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয় ব্যক্তির আগ্রহ, তার জানার, শেখার ও করার মানসিকতা। সাংগঠনিক দক্ষতার ক্ষেত্রে অতীব জরুরী বিষয়াবলী নিম্নে আলোচনা করা হল।

ক. উচ্চ মানসিকতা :

সাংগঠনিক দক্ষতার ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রয়োজন দায়িত্বশীলের উচ্চ মানসিকতা। তার মাঝে অবশ্যই থাকতে হবে সর্বজয়ী, আকাশছোঁয়া

উচ্চাশা। দায়িত্বশীলকে কাজ করতে হবে বিশ্ব জয়ের নেশায়। ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মী সে যত ক্ষুদ্র বা দূর্বলই হোকনা কেন তার মাঝে অবশ্যই থাকতে হবে সারা জাহানের নেতৃত্ব দেয়ার বাসনা। তাকে সর্বদা কাজ করতে হবে উম্মাহর বিশাল ফিকিরকে মাথায় নিয়ে। কারণ এতবড় ভাবনার ও দায়িত্ব গ্রহণের সাহস যুগিয়েছেন বরং নির্দেশ দিয়েছেন বিশ্বজাহানের মালিক মহান আল্লাহ তা'য়ালা। তিনি তাঁর রাসূল স. কে জানিয়ে দিয়েছেন: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ অর্থাৎ- আমি আপনাকে বিশ্ব জাহানের সকল মানুষের জন্য প্রেরণ করেছি। (সূরা সাবা: ২৮)

কাজেই দায়িত্বশীলকে সারা দুনিয়ার সকলের কল্যাণের উচ্চ মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। ঘরকুনো-ক্ষুদ্র চিন্তা-ভাবনা মাথাথেকে একেবারেই ঝেড়ে ফেলতে হবে। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া ইসলামী আদর্শের পূর্ণ খেলাফ। কুল কিনারাহীন মহা-সমুদ্রের ন্যায় হৃদয়টাকে বিশালাকায় করতে হাবে। গতানুগতিক নয় ইসলাম, দেশ ও মানবতার জন্য বিশাল কিছু, স্মরণীয় কিছু করার ফিকির রাখতে হবে সর্বদা।

খ. সাংগঠনিক প্রজ্ঞা:

প্রজ্ঞা মহান আল্লাহ প্রদত্ত এক বড় নেয়ামত। আরবীতে একে বলা হয় حِكْمَةٌ، بَصِيْرَةٌ এর আরেক অর্থ হল, দূরদর্শিতা। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এটি যেমন প্রয়োজন তার চেয়ে শতগুণ বেশি প্রয়োজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির জন্য। কুরআন পাকে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي অর্থাৎ- হে নবী আপনি বলে দিন; এটি আমার কর্তব্য যে আমি লোকদেরকে দূরদর্শিতার সাথে আল্লাহর দিকে আহবান করব। (সূরা ইউছুফ: ১০৮)

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا অর্থাৎ- আমি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করি। আর

যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে তাকে মূলত: অনেক কিছুই দেয়া হয়েছে। (সূরা বাকারা: ২৬৯)

কাজেই ইসলামী আন্দোলনে চিন্তা-চেতনা, বক্তব্য-বিবৃতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহ সকল কাজে অবশ্যই দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। যেকোন সংকট থেকে সংগঠনকে উত্তরণের ক্ষেত্রে দূরদর্শি ভূমিকা পালন করার যোগ্যতা অর্জন করা প্রতিটা দায়িত্বশীলের কর্তব্য।

দূরদর্শিতা অর্জনের জন্য এ পুস্তকে আলোচিত দায়িত্বশীলের অন্যান্য মৌলিক গুণাবলী অর্জন করা জরুরী। বিশেষ করে দায়িত্বশীলকে অবশ্যই তাকওয়া অর্জন করতে হবে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا অর্থাৎ- হে ঈমানদারগণ যদি তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর তবে তোমাদেরকে ফোরকান (ভাল-মন্দ. সত্য-মিথ্যা নিরুপণকারী) নামক নেয়ামত দান করা হবে। (সূরা আনফাল:২৯)

আল্লাহ পাক কাউকে 'ফোরকান' নামক এ নেয়ামত দান করলে তার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অনেক সহজতর হয়ে যায়। তবে এটি পেতে হলে দীনের পথে, ত্বাকওয়ার পথে চরম মোজাহাদা করা একান্ত আবশ্যক।

গ. সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার মানসিকতা ও যোগ্যতা :

সাংগঠনিক শৃঙ্খলা হল সংগঠনের প্রধানতম একটি মৌলিক উপাদান। শৃঙ্খলাবিহীন সংগঠনকে মূলত সংগঠনই বলা চলে না। এ শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দায়িত্বশীলের ভূমিকাই মূখ্য। সেক্ষেত্রে দায়িত্বশীলকে কমপক্ষে নিম্নের গুণাবলীগুলো অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন।

● **আনুগত্য :** ইসলামী আন্দোলনে উর্ধতনদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে সামান্যতম শিথিলতা বরদাশ্‌তযোগ্য নয়। ব্যক্তিগত সকল কাজও মূল নেতৃত্বের পরামর্শ অনুযায়ী করতে হবে। যত কষ্টই

হোক সংগঠনের সিদ্ধান্তের বাইরে কাজ করলে সে আর যাই হোক ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল হওয়ার নূন্যতম যোগ্যতা রাখে না।

● **অন্যদেরকে পরিচালনার যোগ্যতা :** অন্যদেরকে পরিচালনার যোগ্যতা না থাকলে সে নিজে কর্মী হতে পারে কিন্তু দায়িত্বশীল হতে পারে না। এটি দায়িত্বশীলের মৌলিক গুণ। তবে ইচ্ছে করলেই অপরকে পরিচালনা করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত জ্ঞান, আমল, দক্ষতা ধৈর্য্য, সময়ানুবর্তিতা, ব্যক্তিগত কুরবানীর দৃষ্টান্ত সহ দায়িত্বশীলের অন্যান্য সকল গুণাবলী অর্জন করা। বসে বসে শুধু অন্যকে নির্দেশ করে সাথী ভাইদেরকে পরিচালনা করা যায় না। রাসূল স. অন্যদেরকে জিহাদে নামিয়ে দিয়ে নিজে ঘরে বসে থাকেননি বরং নিজে সিপাহসালারের ভূমিকা পালন করেছেন। খন্দকের যুদ্ধের পূর্বে পরিখা খনন করার সময় সাহাবায়ে কেরামগণ রা. না খেয়ে পেটে একটি পাথর বেঁধেছেন আর রাসূল স. অধিক ক্ষুধার কারণে দুটি পাথর বেঁধেছেন। তাইতো সাহাবায়ে কেরাম রা. প্রচন্ড ক্ষুধা-পিপাসা নিয়েও কাজ করেছেন আর আনন্দে গেয়ে উঠেছেন:

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّد عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا ً أَبَداً

অর্থাৎ- আমরা মুহাম্মদের স. হাতে বায়াত গ্রহণ করেছি, জিহাদের কঠিন ময়দানে সর্বদা তাঁর সাথেই অবস্থান করব। সাহাবায়ে কেরামের কণ্ঠে দৃঢ়তার সাথে এ ঘোষণা শুনে রাসূলও স. গেয়ে উঠলেন :

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ = فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ অর্থাৎ- হে আল্লাহ আমরা ঘোষণা করছি পরকালের সুখ শান্তিই আসল সুখ-শান্তি। কাজেই আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দিন। (বুখারী শরীফ)

মনে রাখতে হবে, ইসলামী আন্দোলনে অপর সাথি ভাইয়েরা আপনার কেনা গোলাম নয় আবার সংগঠনের ক্ষতি হয় এমন ক্ষেত্রে ছাড়ও দেয়া যাবে না।

● **দাফতরিক শৃঙ্খলা:** সংগঠনের দফতর সু-শৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। এ যোগ্যতার অভাবে অনেক সময় সুষ্ঠুভাবে সংগঠন পরিচালনা করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। দায়িত্বশীলকে জিম্মি হয়ে পড়তে হয় কোন কোন ক্ষেত্রে। আর্থিক লেনদেনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান না থাকলে সচ্ছভাবে অনেক কুরবানী করা সত্ত্বেও অনাকাংখিত ও অপ্রত্যাশিত অনেক বদনামের ভাগি হতে হয় দায়িত্বশীলকে। তাকে দফতরিক গোছগাছ ও পরিপাটির প্রতি কোনক্রমেই উদাসীন হলে চলবে না। এতে সংগঠনের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুন্ন হয়।

গ. সকল কাজে দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা :

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় রাসূলকে নিজ কাজে অধিক দৃঢ় করার জন্য কুরআনপাকের বিভিন্ন জায়গায় নির্দেশমূলক ভাবে বলেছেন :

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا

অর্থাৎ: হে নবী আপনি যেভাবে নির্দেশিত হয়েছেন তার উপর দৃঢ় মজবুত থাকুন এবং বিপথগামী হবেন না। (সূরা হুদ: ১১২)

কাজের মধ্যে দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা না থাকলে কোন কাজই সুন্দর ও যথার্থ হয় না। সংগঠনের এ কাজটি আমাকে করতেই হবে, আমি কেন পারব না, প্রতিটি দায়িত্ব আমি পালন করবই ইনশাআল্লাহ। এমন দৃঢ়তা এবং কর্মতৎপরতা না থাকলে তার দ্বারা সংগঠনের ভাল কিছু আশা করা যায় না। কাজটি যত গুরুত্বপূর্ণই হোক সময় হলে করলাম, না হলে দরকার নেই, শরীরটা ফুরফুরে না হলে কাজে মনোনিবেশ হয় না, এমন ব্যক্তি আর যাই হোক দায়িত্বশীল হতে পারে না। তার দ্বারা ইসলামী আন্দোলনের চরম ক্ষতি সাধন করার কোন মানে হতে পারে না। কারণ; এসব আচরণ ইসলামের সাথে চরম সাংঘর্ষিক, রাসূল স. ও তাঁর সাহাবা রা. সহ যুগে যুগে নেতৃত্ব প্রদানকারী ইসলামের সকল ব্যাক্তিত্বের আচরণ পরিপন্থী। রাসূল স. ইসলামী আন্দোলনে কতটা তৎপর ছিলেন সকল দা'ওয়াতী কার্যক্রম, জিহাদে অংশগ্রহণ ও পরিচালনাকরণ সহ তাঁর পুরো সীরাতটাই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে।

একজন দায়িত্বশীল হবেন উদ্যোগী, উদ্যমী, কর্মঠ, সদা তৎপর, কাজে সদা প্রফুল্ল, নিরলসভাবে কাজে অভ্যস্ত, চরম সহিষ্ণু, আসমান সম হৃদয়ের অধিকারী। তিনি হবেন সকল কাজের উদ্যোক্তা। তার কর্মদ্যোমতা ও কর্মতৎপরতা দেখে কর্মস্পৃহা বেড়ে যাবে অন্যদের, প্রাণে চাঞ্চল্যতা ফিরে আসবে, আশাবাদী হয়ে উঠবে সকলেই, লজ্জাবোধ করবে অলস বুদ্ধিমানেরা, হিংসুক ও নিন্দুকদের মুখে পরবে ছাই। কিন্তু এর বিপরীত হলে সংগঠনের যে বারোটা বাজবে তা একটু আগেই বলা হয়েছে।

ঘ. দায়িত্বশীলের কাজের গতিশীলতা :

দায়িত্বশীলের প্রতিটি কাজে গতিশীলতা থাকা অত্যাবশ্যকীয়। ঢিলেঢালা ও অলসতা 'দায়িত্বশীল' শব্দটির পরিপন্থী। দায়িত্বশীলের যদি 'আঠারো মাসে বছর' হয় তাহলে কর্মীদের হবে কত মাসে? সাংগঠনিক কাজ ছাড়াও ব্যক্তিগত সকল কাজের ক্ষেত্রেও গতিশীলতার পরিচয় দিতে হবে। তবে অতি তাড়াহুড়া বা অযথা তাড়াহুড়া করাও কাম্য নয়। সময় পাইনি তাই কাজটি করতে পারিনি এমন কথা খুব বেশি গ্রহণযোগ্য নয়। অলসতায় সময় না কাটিয়ে কিংবা অন্য আর পাঁচটি কাজ মনোযগ দিয়ে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করে এ কাজটিও করতে পারা দক্ষতার পরিচায়ক। সর্বদাই নিজেকে সকল কাজের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে। হযরত ওমর রা. এর অন্যতম মৌলিক গুণ এটা ছিল, তিনি সর্বদা যে কোন কাজের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। হিজরতের রাতে হযরত আবু বকর রা. এর দরজায় এসে রাসূল স. দাড়িয়ে থাকতে হয়নি এক মুহূর্তও। ডাক দিতেই দরজাটি খুলে দিলেন তিনি। হিজরতের এ দীর্ঘ সফরের যাবতীয় প্রস্তুতি তিনি সম্পন্ন করে রেখেছিলেন পূর্বেই। পথ নির্দেশক, পথের ছামানা, কোন পথে যাবেন, পরে খাবার কে পৌঁছে দিবে? কিভাবে দিবে ইত্যাদি। রাসূল স. এর সামান্যতম ইশারা পেয়ে তিনি এসব ঠিক করে রেখেছিলেন অনেক পূর্বেই। তাইতো তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা, এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

ঙ. সৃজনশীলতা :

এটি দায়িত্বশীলের একটি অন্যতম মৌলিক গুণ। দায়িত্বশীল মানেই হল সে একজন পরিকল্পক, সে একজন পরিচালক। সংগঠনকে বেগবান করতে হলে দায়িত্বশীলকে নিত্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। সংগঠনের সুবিধা-অসুবিধায়, অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায়, রাষ্ট্রীয় নানা আইন কানুনের কারণে তাকে নতুন ধরণের নানা কর্মসূচি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়, অনেক সময় কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করতে হয় ত্বরিৎ গতিতে, অনাকাঙ্খিত ও অপ্রত্যাশীত অবস্থায় উপস্থিত অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় দায়িত্বশীলকে। কাজেই সে যদি সৃজনশীল মানসিকতার না হন তাহলে সংগঠন চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

সৃজনশীলতার কারণে সময়মত যথাযথ কর্মসূচি পালন করতে পারলে সংগঠনকে অল্প সময়ে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, আবার এর বিপরীত হলে ইসলামী আন্দোলন অবশ্যই পিছনে পরে থাকবে।

চ. নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির যোগ্যতা :

ইসলামী আন্দোলনে কাজ করার সুযোগ পাওয়া অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। এজন্য মহান রবের দরবারে কবুলিয়াতের বিষয় রয়েছে। দায়িত্বশীল হওয়ার ব্যাপারটা আরো উন্নত। এসব সত্ত্বেও নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য দায়িত্বশীলকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। নতুন নেতৃত্ব গঠনের যাবতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি তা প্রয়োগ করাও জানতে হবে। একই সাথে সম্ভাবনাময়ী নেতৃত্বকে কিভাবে আরো অগ্রসর করা যায় সেদিকেও খেয়াল রাখা অতীব জরুরী। অনেক সময় সম্ভাবনাময় নেতৃত্বে উর্ধ্বতন নেতৃত্বে অযোগ্যতা কিংবা অবহেলার কারণে হারিয়ে যায় বা নিষ্ক্রীয় হয়ে যায়, এটা চরম দূঃখ জনক। এর জন্য উর্ধ্বতনকে অবশ্যই গুনাহগার হতে হবে। অন্যদেরকে উৎসাহ দিয়ে, সৎ সাহস যুগিয়ে, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে, পূর্ব পরিকল্পনা নিয়ে অত্যন্ত দরদ মাখা হৃদয়ে আন্তরিকতা ও বিচক্ষণতার

সাথে এ কাজ আন্জাম দিতে হবে। নিজের অযোগ্যতার কারণে অন্যকে নিরাশ করার সুযোগ ইসলাম কাউকে দেয়নি।
যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য রাসূল স. দোয়া করেছিলেন: اَللّٰهم أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِعُمَرَ أَوْ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ অর্থাৎ-হে আল্লাহ তুমি ওমর ইবনুল খাত্তাব কিংবা আমর ইবনে হিশামকে ইসলামের ছায়াতলে এনে ইসলামকে শক্তিশালী করুন। (বুখারী শরীফ)

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: اَلنَّاسُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، خِيَارُهُمْ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِيْ الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا অর্থাৎ- 'মানুষ স্বর্ণ-রৌপ্যের খনিজ তুল্য। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে উত্তম সে ইসলাম গ্রহণের পরেও উত্তম যদি ইসলামের শিক্ষা গ্রহন করে'। কাজেই খারাপ পথে নেতৃত্বদানকারীরা ইসলাম গ্রহণ করলে নেতৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম হয়।

৪. নম্র ও সদ্ব্যবহার :

দায়িত্বশীলকে অবশ্যই পারস্পরিক নম্র ও কোমল আচরণ করতে হবে। সংগঠন বা সংঘবদ্ধ ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলের অন্যতম কাজ হল, কর্মীদেরকে একে অন্যের সাথে জুড়ে দেয়া, নিজেদেরকে পারস্পরিক দৃঢ় ও মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ করা, সংঘবদ্ধ ও সু-সংহত করা। এজন্য দায়িত্বশীলকে যেটি করতে হয় তা হল: নিজের মধ্যে চৌম্বকত্ব সৃষ্টি করা, অন্যকে জড়িয়ে বা আটকে রাখার যোগ্যতা সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে একটি উত্তম উদাহরন হল: কাদামাটি আর শুকনা মাটি। কাদামাটির এ যোগ্যতা আছে যে সে অপর কিছু কাদামাটি এমনকি শুকনা মাটির টুকরাকেও অনায়াসে আটকে রাখতে পারে। পক্ষান্তরে শুকনা মাটির কিন্তু এ যোগ্যতা বা ক্ষমতাটুকু নেই। তাইতো একজন দায়িত্বশীলকে অবশ্যই নিজেদের মাঝে পারস্পরিক নরম ও কোমল আচরণ করতে হবে। কথায় বলে মুখে মধু মাখো তবে বিশ্বজয় করতে পারবে। কাজেই সকলের সাথে সু-মিষ্ট ভাষায় কথা বলা, ছোট-বড় সকলকে আগে ছালাম দেয়া, হাসিমুখে বিনিময় করা, এককথায় সর্বত্র

সদাচরণের মাধ্যমে অপর ভায়ের হৃদয় জয় করার যোগ্যতা তাকে অর্জন করতে হবে। প্রথম সাক্ষাতেই অপরিচিত ব্যক্তিটি অবিভূত হয়ে যেন বলতে বাধ্য হয় ছেলেটি বা লোকটি অসাধারণ, চমৎকার। ইসলামী আন্দোলনের সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম দায়িত্বশীল রাসূলে মাকবুল স. কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ অর্থাৎ- (হে নবী) আল্লাহর মেহেরবাণীতে আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি তাদের প্রতি রূঢ় হতেন তাহলে তারা আপনার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। (সূরা আল ইমরান: ১৫৯)

দায়িত্বশীলকে তার কর্মীদের সাথে তো বটেই সাধারণ মানুষের সাথেও রূঢ় আচরণ করা যাবে না। প্রচন্ড কাজ ও মানসিক চাপ, রাগ, ক্ষোভ, শারীরিক অসুস্থতা, ইত্যাদি কারণে মানুষের আচরণ অনেক সময় রূঢ় হয়ে যায়। দায়িত্বশীলকে এসব মানবীয় দূর্বল অবস্থাকেও সামলে নিয়ে কোমল আচরণ করতে হবে। তারপরও যদি নিজেকে সামলে নেয়া সম্ভব না হয় তবে কাজের ক্ষতি না হলে সাময়িক সময়ের জন্য স্থান ও পরিবেশ পরিবর্তন করা যেতে পারে।
তবে অন্যায়ের প্রতিরোধে কিংবা বাতিলের মোকাবেলায় নম্র হলে চলবে না। সেখানে নিজেকে স্বযত্নে আগলে রাখার বা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। প্রচন্ড প্রতিরোধ করতে হবে প্রজ্ঞার সাথে। কোন আপোস চলবে না তখন।

দায়িত্বশীলদের সামগ্রিক আচরণ হবে সাহাবায়েকেরাম রা. এর মত। কালামে পাকে বর্ণিত হয়েছে: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ-মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তাঁর সাথীবর্গ কাফেরের মোকাবেলায় অত্যন্ত কঠোর কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহমর্মী। (সূরা ফাতাহ: ২৯)

তবে সাংগঠনিক কাঠামো, প্রটোকল, প্রশাসন ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় এবং অনুগত্যের ক্ষেত্রে নূন্যতম শীথিলতা প্রদর্শিত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি করে এমন কোমল আচরণ আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। দায়িত্বশীলের সরলতা কিংবা নম্র আচরণকে কেউ যেন দূর্বলতা না ভাবে এবং এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজ, সংগঠন, ইসলাম কিংবা কোন পর্যায়ে ক্ষতি করতে না পারে সে দিকে সদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। স্বয়ং রাসূল স. বৈষয়িক ক্ষেত্রে কখনই নিজের মান মর্যাদা ও অবস্থানকে ছোট করে দেখেন নি বা ভুলণ্ঠিত করেন নি। তবে তিনি অহমিকাও প্রকাশ করেন নি। তিনি সাথে সাথে বলে দিয়েছেন : অর্থাৎ কোন অহংকার নেই। বাতিলের সামনে নিজের অবস্থান সৃষ্টি করে বলেছেন : أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ = أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ অর্থাৎ- আমি নবী, এতে কোন মিথ্যে নেই। আমি (বিখ্যাত) আব্দুল মুত্তালিব এর বংশধর। (বুখারী শরীফ)

খ. অপরের প্রতি সদয় হওয়া :

রাসূল স. এরশাদ করেন: "خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسِ" অর্থাৎ: তোমাদের মাঝে সেই উত্তম যে মানুষের উপকার করে।
(জামিউল আহাদীস, খ: ৩৪, পৃ: ৪৩০)

তিনি অন্যত্র এরশাদ করেন : اِرْحَمُوْا مَنْ فِىْ الأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِىْ السَّمَاءِ

অর্থাৎ: পৃথিবীবাসীর প্রতি সদয় হও তবে আসমানের অধিবাসীরা তোমাদের প্রতি সদয় হবে। (আবু দাউদ, বায়হাকী)
অন্যের প্রতি সদয় হওয়া, অপরের সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়ানো, সহপাঠি ও প্রতিবেশীর সমস্যা দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা, অপরাপর ভায়ের দায়িত্বের বোঝা লাঘবে মনোনিবেশ করা, মোট কথা খেদমতে

খাল্‌ক বা সৃষ্টির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা একজন দায়িত্বশীলের মৌলিক গুণাবলী।
জাবালে নূর তথা হেরা গুহায় রাসূল স. এর নিকট প্রথম ওহী আসার পর এ অজানা অচেনা পরিস্থিতির আকস্মিকতায় তিনি ভীত সন্ত্রস্থ ও জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় হযরত খাদিজা রা. অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে রাসূলকে স. সান্তনা দিয়ে বললেন আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা কখনও আপনাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন না । আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অপরের বোঝা বহন করে তার বোঝাকে হাল্কা করেন, অভাবী লোকের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন, মেহমানের খাতির-যত্ন ও মেহমানদারী করে থাকেন এবং দীনের পথে চলতে অন্যের বিপদ মুছিবতে সাহায্য করেন। (সহীহ বুখারী)
সহকর্মী, সংগঠনের অধঃস্তন দায়িত্বশীল ও কর্মীদের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ : আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হন। (সূরা আশ্ শুরা : ২১৫)

গ. অপরের অধিকারকে প্রাধান্য দেয়া :

দায়িত্বশীলের সদাচারণের মধ্যে একটি হল নিজের স্বার্থ ও চাহিদাকে প্রাধান্য না দেয়া। স্বার্থবাদী আচরণের কিঞ্চিত বহিঃপ্রকাশও ঘটানো যাবে না। রাসূল স. মদীনায় হিজরত করার পর আনছার সাহাবা রা. গণ ব্যাপকভাবে মুহাজির ভাইদেরকে সহযোগিতা করেছিলেন। নিজের পছন্দের, ভাল ও সখের সম্পদটি মুহাজির ভাইকে দিয়ে নিজে অপেক্ষাকৃত খারাপটি গ্রহণ করেছিলেন কিংবা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। প্রয়োজনে নিজেরা না খেয়ে কিংবা খাওয়ার ভান করে মুহাজির ভাইকে খাইয়েছেন। তাদের এ ত্যাগ-কুরবানী ও মধুর আচরণ আল্লাহ তা'আলার নিকট এতটাই পছন্দ হয়েছে যে তাঁদের এ গুণাবলী বর্ণনা করে তিনি আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ অর্থাৎ : তাঁরা

নিজেদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও অন্যকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। (সূরা হাশর: ৯)
দায়িত্বশীলগণ প্রতিনিয়ত একে অন্যের খোঁজ নিবেন। প্রয়োজনে নিজের স্বার্থকে অপরের তরে অকাতরে হাসিমুখে বিলিয়ে দিতে সদা সচেষ্ট থাকবেন।

৫. সাহসিকতা :

ক. মাথা অবনত হবে কেবল আল্লাহরই জন্য। একজন দায়িত্বশীলকে প্রচন্ড রকমের সৎ সাহসের পরিচয় দিতে হবে। তাকে খেয়াল রাখতে হবে সে কেবল মহান সৃষ্টিকর্তা, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকেরই ইবাদত করে। কেবল তাকেই অবনত মস্তকে সিজ্‌দা করে। ফলে অন্য কোন মাখলুকের সামনে চাই সে যতবড় ক্ষমতাধর কিংবা শক্তিশালীই হোক না কেন নূন্যতম অবনত হওয়ার কোন সুযোগ ইসলাম তাকে দেয়নি। দৃঢ় চিত্তে সত্য কথা বলতে সামান্যটুকু কুণ্ঠাবোধ করার সুযোগ নেই। একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বান্দা বা গোলাম হিসেবে তাঁর জমিনে তাঁরই বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়ার সর্বত্র, সর্ব মহলে, সকল পরিবেশে বীরদর্পে বিচরণ ও সত্য প্রকাশের জন্য সৎ সাহস রাখতে হবে। হৃদয়ের কন্দরে বিন্দুসম অনুকম্পাও গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ইসলামী শিষ্টাচার যেন লজ্ঘিত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখাও জরুরী । সর্ব মহলে এমন সাহসিকতাপূর্ণ আচরণের জন্য অন্যতম পূর্ব শর্ত হল নিজের জ্ঞান ভান্ডারকে প্রয়োজন অনুযায়ী সমৃদ্ধ রাখা এবং আল্লাহর কুদরত ও বড়ত্ব সম্পর্কে একীন এবং দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে সৃষ্টি করা।

জালিম শাহিকে পরওয়া না করা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
অর্থাৎ : হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং ন্যায্য কথাটি বল। তবে তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন ও পাপসমূহ

ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আহযাব: ৭০-৭১)
রাসূল স. ইরশাদ করেন: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
অর্থাৎ : জালিম শাহির সামনে সত্য কথা বলাই হল উত্তম জিহাদ। (ফতহুল বারী, খ: ১৩, পৃ: ৫৮)
উল্লেখিত আয়াতে কারীমা ও হাদিসটিতে সত্য, ন্যায্য ও যথাযথ কথা বলার জন্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। এর বিনিময়ে তিনি আমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন ও পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। এথেকে বুঝা যায় সত্য যত তিক্তই হোক না কেন তা বলতে কুণ্ঠাবোধ করা কিংবা এ থেকে পিছু হটা একজন মুমিনের বৈশিষ্ট কোন ক্রমেই হতে পারে না।
রাসূল স. এর সাহসিকতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে:
كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا ، وَ كَانَ وَ كَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ ، وَ لَقَدْ فَزَعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، أَجْوَدَ النَّاسِ ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الصَّوْتِ ، فَالْتَقَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَاجِعًا ، وَ قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ .
অর্থাৎ- রাসূল স. এর চেহারা মোবারক ছিল সুদর্শনা, তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দানবীর ও সাহসী। একদা এক রাতে প্রচন্ড আওয়াজ শুনে মদিনাবাসী আওয়াজটির দিকে ছুটল। লোকেরা ঘর থেকে বের হয়ে দেখতে পেল রাসূল স. ইতোমধ্যেই সে আওয়াজের স্থল পরিদর্শন করে ফিরে আসছেন। তিনি সকলের পূর্বেই ভীতিকর আওয়াজস্থল সাহসিকতার সাথে ঘুরে এসেছেন। (শায়খ মু. জামীল জিন্নু এর রচনাবলী)
কেমন ছিল পূর্বসূরীদের সৎ সাহস? একদা হযরত সা'দ রা. তৎকালীন পরাশক্তি পারস্য সেনাপ্রধান রূস্তমের কাছে হযরত রিবঈ ইবনে আমের রা. কে দূত নিযুক্ত করে পাঠান। মুসলিম দূতকে প্রভাবিত ও প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে মূল্যবান গালিচা দ্বারা সজ্জিত করা হল সেনাপতির দরবার কক্ষ। স্বয়ং রুস্তম দামী ইয়াকূত ও মনি-মুক্তা খচিত মহামূল্যবান

পোষাক পরিধান করে স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট। তার মস্তকে শোভাপাচ্ছে দামী মুকুট। অপর দিকে মুসলিম দূত হযরত রিবঈ রা. এর পরনে ছিল তালিযুক্ত জুব্বা, ছেড়া মোজা, কাপড়ে পেঁচানো খাপহীন তরবারী। সাথে ছোট একটি ঢাল আর যেন তেন একটি ঘোড়া। নরম গদিআঁটা একটি আসনের সাথে ঘোড়াটি বেঁধে রেখে কোনদিক ভ্রূক্ষেপ না করে মুসলিম দূত সোজা এগিয়ে গেলেন সেনাপতি রুস্তমের দিকে সংহত পদক্ষেপে। সেনাপতিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য দরবারিদের একজন তখন তাকে অনুরোধ জানাল। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তিনি উত্তর দিলেন: এটা আমার কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত নয়। তাছাড়া আমি স্বেচ্ছায় এখানে আসিনি। তোমাদের আমন্ত্রণেই এসেছি। আমাকে অবাধ ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে দাওতো ভালো, নয়তো এখান থেকেই আমি ফিরে যাচ্ছি। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে রূস্তম দরবারীদের থামিয়ে দিয়ে বললেন: তাকে আসতে দাও। অতঃপর হযরত রিবঈ ইবনে আমের রা. মূল্যবান গালিচা মাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। সবুজ গালিচার স্থানে স্থানে ফুটো হলো তরবারির খোঁচায়। বিস্ময়-বিমূঢ় দরবারিদের নির্বাক দৃষ্টি চারদিক থেকে বিদ্ধ করছিল তাকে। কিন্তু তিনি নির্বিকার। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

ইতিহাসের পাতায় মুসলিম সেনাদের এমন ঘটনা দু'একটি নয়, শত সহস্র। কারণ মুসলিম জাতিই এমন সিংহের জাতি। ইসলামী আন্দোলনের সকল দায়িত্বশীলকে এমন বিরোচিত ভূমিকা পালন করতে হবে সর্বদা।

খ. প্রজ্ঞার সাথে কাজ করা :

লক্ষণীয় বিষয় হল, সাহসিকতা পূর্ণ কথা বা কাজটি অবশ্যই হেকমত বা প্রজ্ঞা ও উত্তম ভাষায় হতে হবে। অন্যথায় কোন কোন সময় এ সাহসিকতা ক্ষতির মহা কারণ হয়ে যেতে পারে।

গ. পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করা :

দায়িত্বশীলদের সকল কাজই হবে পরামর্শভিত্তিক। যথাযথ পরামর্শভিত্তিক কোন কাজের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে তা বাস্তবায়নে নেমে পরতে হবে তা যত বড় ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টসাধ্যই হোক না কেন। প্রোগ্রাম ব্র্যুস্তবায়নের ক্ষেত্রে দৃঢ় থাকতে হবে। দীনের কাজে কাপুরুষতাপূর্ণ আচরণ কখনই কাম্য নয়। সহীহ ইসলামী সংগঠনের সিদ্ধান্তকে জীবনের সকল ঝুঁকি, সকল প্রত্যাশা এক কথায় সকল কিছুর উপর প্রাধান্য দিতে হবে। তবেই আশা করা যায় আল্লাহ তা'য়ালার নুসরাত বা সাহায্য অবশ্যই টার্গেটে পৌঁছতে সাহায্য করবে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন: فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ অর্থাৎ : অত:পর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর উপর নির্ভরশীল ব্যাক্তিদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আল-ইমরান : ১৫৯)

সংগঠনের উর্ধ্বতন শাখা বা দায়িত্বশীলের নির্দেশনা সাহসিকতার সাথে যেকোন মূল্যে বাস্তবায়ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকতে হবে। কেননা أُولُو الْأَمْرِ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব।

এছাড়াও সাম্প্রতিক কালে যামানার সিপাহসালার, শায়খ হযরত মাও: সৈয়দ মু. ফজলুল করীম র. এর নেতৃত্বে ভন্ড দেওয়ানবাগীকে উৎখাতের জন্য যে আন্দোলন হয়েছে তা হিম্মত বা সাহসিকতার সত্যিই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অস্ত্রহীন মুজাহিদদের মোকাবেলায় সশস্ত্র দেওয়ানবাগীর গুন্ডারা পালাতে বাধ্য হয়েছিল।

৬. বাগ্মিতা বা দক্ষ বক্তা হওয়া :

কেবল দাঈ-ইলাল্লাহ ও ইসলামী আন্দোলনের একজন দায়িত্বশীলের মাঝে অনেকগুলো মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সে সবের মধ্যে একটি হল : ইসলামী আন্দোলনের সকল দায়িত্বশীলই দাঈ-ইলাল্লাহ। কিন্তু কেবল দাঈ-ইলাল্লাহ হলেই সে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল হন না

বা হতে পারেন না। দাঈ-ইলাল্লাহ এর কাজ নানা ভাবে করা যায়। যেমনঃ কথার দ্বারা, লিখনীর দ্বারা, উত্তম ব্যবহারের দ্বারা ইত্যাদি। কিন্ত ইসলামী আন্দোলনের একজন দায়িত্বশীলের মাঝে এসব মৌলিক গুণাবলীর পাশাপাশি আরো অসংখ্য গুণার্জন করতে হয়। সকল আম্বিয়া আ., তাঁদের খোলাফাগণ, যুগে যুগে গোটা বিশ্বব্যাপী যাঁরা ইসলামের ধারক বাহক ছিলেন, ইসলামের মহান নেতৃত্ব দিয়েছেন, ইসলামের সুমহান আওয়াজকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁরা সকলেই ছিলেন দায়িত্বশীল, কেবল দাঈ-ইলাল্লাহ নয়।

রাসূল স. সালাতের জন্য কেবল আহবানকারীই ছিলেন না বরং ইমামতের দায়িত্ব পালনকারীও ছিলেন। জিহাদের জন্য কেবল আহবানকারী ছিলেন না বরং সেনাপ্রধানের দায়ীত্ব পালনকারী ছিলেন। ইসলামের বিধানাবলী মান্য করার জন্য কেবল আহবানকারী ছিলেন না বরং রাষ্ট্র প্রধানের দায়ীত্ব পালনকারী ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীন কিংবা পরবর্তীতে ইসলামের নেতৃত্বদানকারী সকলেই দায়িত্বশীল ছিলেন এবং তাদের মাঝে এর জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীও বিদ্যমান ছিল।

এসব বিশেষ গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম হল বাগ্মিতা বা দক্ষ বক্তা হওয়া। কারণ; মানুষকে দীনের পথে আহবান করেই দায়িত্বশীলের কাজ শেষ নয় বরং এপথে তাকে মজবুত ভাবে গড়ে তোলা, দীনের তরে সব ধরণের কাজের জন্য প্রস্তুত করা, চরম কঠিন মুহূর্তে এ পিচ্ছিল পথে অটল ও অবিচল রেখে সামনের পানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি এসবই ইসলামী আন্দোলনের একজন দায়িত্বশীলের কাজ। এজন্য দায়িত্বশীলের প্রয়োজন বাগ্মি বা দক্ষ বক্তা হওয়া।

রাসূল সা. নিজ প্রসঙ্গে ঘোষণা করে বলেন: اَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ অর্থাৎ- আমি আরবের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী। তিনি বলেন; أُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ অর্থাৎ- আমাকে অল্প কথায় অধিক অর্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশের বিশেষ গুণ প্রদান করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামগণ রা.

হাজারো কষ্ট নির্যাতন ভোগ করে এসে রাসূল সা. এর মুখ থেকে দু'একটি সান্তনার বাণী শুনে সকল কষ্ট নির্যাতন নিমিষেই ভুলে যেতেন। অত্যন্ত চমৎকার ও যাদুময়ী, প্রাঞ্জল ভাষায় তার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের কাছে কাফের মুশরিকরা মুখোমুখি বৈঠকেও হার মেনেছে শত-শহস্র বার, তারা বিমোহিত হয়েছে সর্বদাই। তাঁর সামান্য বক্তব্যে নিষ্পত্তি হয়ে যেত সমকালের সকল জটিলতম বিষয়াবলী। হুনাইনের যুদ্ধ পরবর্তী আনসার সাহাবী রা. দেরকে উদ্দেশ্য করে রাসূল স. এর ভাষণ, বিদায় হজ্বের ভাষণ সহ তাঁর এমন অসংখ্য বক্তব্যের দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসী কিয়ামত পর্যন্ত হয়ত আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম রা. সহ মুসলিম সিপাহসালারদের এমন হাজারো বক্তব্য জাতিকে উজ্জীবিত করেছে প্রতিবারই। হাজ্জাজ বিন ইউছুফ, যায়েদ বিন আবীহি, স্পেন বিজয়ী তারিক বিন যিয়াদ প্রমূখের বক্তব্য আজো মানুষ স্মরণ করে শ্রদ্ধার সাথে। আমাদের শায়েখ রহ. এর সহজ- সরল বক্তব্য মুহূর্তের মধ্যেই শ্রোতার অন্তরকে আন্দোলিত করত, নিমিষেই মরুরুক্ষ অন্তরকে হেরার নূরে সজীব করে তুলত। কারণ তাকওয়াপূর্ণ, হৃদয় নিসৃত বক্তব্য অবশ্যই অন্য হৃদয়কে আকৃষ্ট করে থাকে।

হযরত মুছা আ. তাঁর মুখের জড়তা দূর করার জন্য মহান রবের দরবারে দেয়া করেছিলেন এই বলে: وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِّسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي অর্থাৎ- আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও। যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্বাহা-২৭-২৮) অন্যত্র হযরত মূছা আ. দোয়া করেন: وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ অর্থাৎ- আমার ভাই হারুনকেউ আমার সাথে রেছালাত প্রদান করুণ কেননা তিনি আমার চেয়েও অধিক সুবক্তা। (সূরা আল-কাসাস: ৩৪)
কাজেই ইসলামী আন্দোলনের একজন দায়িত্বশীলকে পূর্বসূরীদের ন্যায় একজন বাগ্মী বা দক্ষ বক্তা অবশ্যই হতে হবে। বক্তব্য হতে হবে জ্ঞানগর্ভ, অর্থবোধক, মর্মবহুল, বাস্তববাদী, জীবনবোধসম্পন্ন, প্রাণের উচ্ছাস ও হৃদয়ের উষ্ণতায় উত্তপ্ত। বক্তব্যে থাকা চাই জ্যোতির্ময় হেরার

আলোর স্নিগ্ধ বিচ্ছুরণ। এজন্য দায়িত্বশীলকে তার নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত ইলম ও আমলের সমন্বয় সাধনের পাশাপাশী অন্যান্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। বক্তব্যকে মানোত্তীর্ণ করতে বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

খ. বাতিলের মোকাবেলায় :

অন্যায়-অসত্যের মোকাবেলায় বাগ্মিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে: وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ অর্থাৎ- তাদের সাথে উত্তম ভাষায় বিতর্ক করুন। (সূরা নাহল: ১২৫)
অন্যায়-অসত্যেকে যথাযথ জবাব দেয়ার জন্য এ যোগ্যতা অত্যন্ত চমৎকার ভাবে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন: হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত রা. কে লক্ষ্য করে রাসূল স. বলেন: اُهْجُ قُرَيْشًا يُؤَيِّدُكَ رُوْحُ الْقُدُسِ অর্থাৎ- কুরাইশ এর কাফেরদের নিন্দার জবাবে তাদের কেউ নিন্দা কর, নিশ্চয় জিব্রাঈল আ. তোমাকে সাহায্য করবেন। (তারীখু মদীনাতু দিমাশ্‌ক,খ: ১২,পৃ: ৩৯৪)

গ. সুযোগ কাজে লাগানো :

একজন দায়িত্বশীল অযথা মুখ ভার করে বসে থাকতে পারে না। চলতে ফিরতে সুযোগ পেলেই দা'ওয়াত উপস্থাপনের চেষ্টা চালাতে হবে। ক্লাসে, ক্যাম্পাসে, জুমার পূর্বে, সভা-সমাবেশে সুযোগ পেলেই ইসলামী আন্দোলনের দা'ওয়াতকে সুন্দর ও সাবলীল ভাষায়, গঠনমূলক ভাবে উপস্থাপন করতে হবে। শ্রোতাদের অবস্থা ও পরিবেশ বুঝে যথাযথ বক্তব্যটি স্পষ্ট ভাবে উপস্থাপন করাটাই কাম্য। ইসলামী আন্দোলনের একজন দায়িত্বশীল হিসেবে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ আর মুক্তির জন্য সর্বদা দা'ওয়াতের ফিকির মাথায় নিয়ে চলতে হবে। গোটা উম্মতের জন্য নিজের মধ্যে ব্যাথা আর জ্বালা-যাতনা সৃষ্টি করতে হবে। দিলে ব্যাথা নিয়ে শুধুমাত্র ইসলাহের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করলে সাধারণত তা অধিক কার্যকর হয়ে থাকে। রাসূল স. এর মৌলিক দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاصِلَ الأَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ ، طَوِيلُ السَّكْتِ ، لاَ يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ.
অর্থাৎ-রাসূলুল্লাহ স. সর্বদাই চিন্তাগ্রস্থ এবং উম্মতের ফিকিরে মশগুল থাকতেন। তিনি স্বস্তিতে দীর্ঘ বিশ্রাম নিতেন না, দীর্ঘ সময় নিশ্চুপ থাকতেন, বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। (শামায়েলে তিরমিযি,পৃ: ১৩৪)

ঘ. ভাষাগত দক্ষতা অর্জন :

বক্তব্য উপস্থাপন, দা'ওয়াত পেশ কিংবা সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে ভাষাগত যোগ্যতা বা দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজেই বাংলাদেশের পরিবেশে মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি কমপক্ষে অন্য একটি ভাষায়, বিশেষ করে আরবী/ইংরেজী ভাষায় দায়িত্বশীলের অবশ্যই দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। দায়ীর জন্য আঞ্চলিক ভাষা ব্যাবহার করা মোটেই প্রত্যাশীত ও সুখকর নয়।

৭. সময়ানুবর্তিতা :

মানব জীবনের সংক্ষিপ্ত হায়াতে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা অর্জনের জন্য সময়ানুবর্তিতা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়ের অধিক গুরুত্ব আছে বিধায় পবিত্র কুরআনে একাধিক বার মহান আল্লাহ তা'য়ালা সময়ের শপথ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন: وَالْعَصْرِ অর্থাৎ- গোধূলীলগ্নের শপথ। (সূরা আছর: ১), وَالْفَجْرِ অর্থাৎ- ঊষালগ্নের শপথ (সূরা ফজর: ১) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا অর্থাৎ- দ্বিপ্রহরের শপথ (সূরা আশ্‌শামস: ১)। রাসূলুল্লাহ স. প্রতিটি সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করে ঘোষণা করেছেন: اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ অর্থাৎ- পাঁচটি বিষয় আসার পূর্বে পাঁচটি বিষয়কে মহাপ্রাপ্তি মনে করে যথাযথভাবে কাজে লাগাও।

১. যৌবনকে বার্ধক্য আসার পূর্বে।

২. সুস্থতাকে অসুস্থতা আসার পূর্বে।
৩. প্রাচুর্যতাকে দারিদ্রতা আসার পূর্বে।
৪. অবসরকে ব্যস্ততা আসার পূর্বে।
৫. হায়াতকে মৃত্যু আসার পূর্বে।
(ফিকহুদ্দা'ওয়াহ, ইমাম বুখারী রা. খঃ ২ পৃঃ ৪৭৮)

কাজেই সময়কে অযথা গল্প করে, অবহেলায় কিংবা অপ্রয়োজনীয় কাজে নষ্ট করা সাধারণ বোধসম্পন্ন কোন মানুষের কাজ হতে পারে না। নির্বোধ পাগলের দ্বারাই কেবল এমনটা করা সম্ভব।

এক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের একজন দায়িত্বশীল আরো বেশি ব্যতিক্রম। তাকে সংগঠনের দায়িত্বের পাশাপাশি ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলোও মিটাতে হয়, স্বাভাবিক পড়াশুনার সাথে সাথে একাডেমিক পড়া-শুনায়ও ভাল ফলাফল করতে হয়। সেজন্য সময়ের প্রতি দায়িত্বশীলের সচেতনতা হতে হবে অন্যদের চেয়েও অধিক। পৃথিবীতে যারা বড় হয়েছেন তাঁরা জীবনের একটি সেকেন্ডও অপচয়ের তালিকায় উঠতে দেননি। কাজেই দায়িত্বশীলকে নিম্নের বিষয়গুলে অনুসরণের প্রতি বিশেষ জোর দিতে হবে।

ক. কোন ক্ষেত্রেই সময় অপচয় করা যাবে না। প্রতিটি মুহূর্তকে অতি মূল্যবান মনে করতে হবে। রুটিন মাফিক জীবন পরিচালনার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সংগঠনের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত প্রতিবেদন মূখ্য সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে।

খ. আগামীকাল কী কাজ, রাতে ঘুমের পূর্বেই সিরিয়াল অনুযায়ী ডায়েরীতে তা লিখে নিতে হবে। যেন সকালে উঠে কাজের পরিকল্পনা করতে গিয়ে সময় নষ্ট না হয় কিংবা কাজ এলোমেলো হয়ে না যায়।

গ. সংগঠনের সকল বৈঠক, প্রোগ্রামসহ সব ক্ষেত্রে যথা সময়ে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কার্যক্রম শেষ করার

চেষ্টা করতে হবে। অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে কিছু পূর্বেই উপস্থিত হওয়া চাই। কোন অযুহাতেই যেন বিলম্ব না হয় সেদিকে খুব খেয়াল রাখতে হবে। কোন প্রোগ্রামে বিলম্বে উপস্থিত হলে মৌলিকভাবে যেসব ক্ষতি হয় তার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেয়া হলঃ

১. এটি মুমিনের চরিত্র বিবর্জিত কাজ। কেননা ইসলামই মুমিনদেরকে সবচেয়ে বেশি সময় সচেতন করেছে। অতটা অত মিনিটে সুবেহ সাদেক, ঠিক অত মিনিট পর্যন্ত সাহরী খাওয়া যাবে এর এক সেকেন্ড পরে আর খাওয়া যাবে না। অতটার সময় সূর্যোদয় হবে এতটা এত মিনিট পর্যন্ত ফজরের সালাত আদায় করা যাবে, এর পরে নয়। এভাবে কেবল সালাতের মাধ্যমেই মুমিনকে দৈনিক পাঁচবার সময় সচেতন করা হয়ে থাকে। অথচ বিশ্বব্যাপী মুসলমানরাই আজ সময়ের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উদাসীন। একজন দায়িত্বশীলের ক্ষেত্রে এমন আচরণ একেবারেই গ্রহণ যোগ্য নয়।

২. মুনাফিকের আলামত।
৩. অপর ভাইকে কষ্ট দেয়ার গুনাহ।
৪. অপর ভায়ের সময় নষ্ট করার গুনাহ।
৫. ওয়াদা ভঙ্গের গুনাহ।
৬. সক্রিয় দায়িত্বশীল নিস্ক্রীয় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।
৭. সংগঠনের বড় ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি।

প্রতিটি সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য নিম্নের উপায়গুলো অনুসরণ করা যেতে পারে।

ক. সময় হত্যা থেকে বিরত থাকা :
সময়কে কোন কাজে না লাগানোর অর্থই হচ্ছে সময় হত্যা করা। চাই সে সময় যত অল্পই হোক না কেন। এভাবে মূল্যায়ন করলে দেখা যায় প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠার পর থেকে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত কি

পরিমান সময়কে আমরা হত্যা করি, একদিনের হিসেব টানলেই দেখবেন বুঝমান ব্যক্তিমাত্রই মাথা ঘুরপাক খেতে বাধ্য হবেন। ঘুম থেকে উঠার পর বিছানা থেকেই শুরু হয় রক্তারক্তির। বিছানায় বসেই হত্যা করে ফেলি বেশ কিছু সময়কে। ফজরের সালাতের পূর্বে নিজের অজান্তেই হত্যা হয়ে যায় অসংখ্য সময়। এভাবেই চলতে থাকে প্রতিটি দিন-রাত, সারাটা মাস, বছর এবং সারাটা জীবন। কাজেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে রাত দিনে আমি একটি সেকেন্ডকেও হত্যা করব না, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে যথাযথ কাজে লাগাব, অপচয় হতে দিব না। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى অর্থাৎ- মানুষ সাধনা করে সবই অর্জন করতে পারে।(সূরা নাজম: ৩৯) কাজেই আমরা চেষ্টা করলে সময় অপচয়ের বিশাল ক্ষতি থেকে অবশ্যই বাঁচতে পারব ইনশাআল্লাহ।

খ. সময় ব্যয়ের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ :

আপনি সময়কে অপচয় করলেন না ঠিকই কিন্তু এক ঘন্টার কাজ ২ ঘন্টায় করলেন। কারণ আপনার সময় ব্যয় করার স্বাধীনতা আছে। না, এটা করা যাবে না। এ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দায়িত্বশীলের কাজের গতি হতে হবে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। একঘন্টা সময়ে আপনি কত বেশি কাজ করতে পারেন সে চেষ্টা করতে হবে। সমুদ্রে ওযু করতে বসেছি বলে ইচ্ছে মত পানি ব্যবহার করা যাবে না, ইসলাম এটাকে মাকরুহ বলেছে। এভাবে প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে সময় হেফাজত করে কাজ বাড়ালে বছরে ৩৬৫ ঘন্টা সময়ের কাজ বেশি হবে।

গ. কাজের অগ্রাধিকার তালিকা করা :

কাজের অগ্রাধিকার তালিকা না থাকলে আপনি ইচ্ছামত কাজ করতে পারেন। ফলে দিনের শেষে ধরা পড়বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ পড়ে গেছে আর কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয়েছে। কাজের অগ্রাধিকার

তালিকা করা থাকলে কোন কাজ যদি বাদ দিতে হয়, তো কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ দেয়া সম্ভব হবে। কর্মব্যাস্ত দায়িত্বশীলকে জন্য এটি দারুণভাবে সহযোগিতা করবে।

ঘ. দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করতে হবে :

কোন কাজ কোন সময় করবেন? কোনটা করবেন, কোনটা করবেন না? এ নিয়ে অনেকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেন যা মোটেই ঠিক না। এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অযথা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। কারো কারো এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পুরো দিনটাই কেটে যায়, কোন কাজ আর করা হয় না। এটি খুবই নিন্দনীয় স্বভাব। নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করে, দ্বিধা-দ্বন্দ দূর করে নির্বিঘ্নে কাজ করে যেতে হবে। কাজের তালিকা পূর্বের দিন করে রাখলে এ সমস্যায় আর পরতে হবে না।

ঙ. সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করা :

ইসলামের মৌলিক শিক্ষাই হল যখন যে কাজ তখন সেটি করা। সালাতের সময় হয়েছে তো সালাত আদায় করে নেয়াটাই তখন কর্তব্য। যখন যে কাজের সময় তখন তা না করে অন্য কাজ করলে তাতে যথাযথ মনোনিবেশ থাকে না। ফলে কাজে ভুল, অসুন্দর ও বিলম্বিত হয়। অন্য সময়ে করতে গেলে উপায়-উপকরণ এবং সহযোগিতা না পাওয়ায় প্রচুর সময় অপচয় হয়।

এছাড়াও অনেক সময় একটি কাজ করতে গেলে অন্য আরো পাঁচটি কাজ তখন এসে ভিড় জমাতে পারে। সেক্ষেত্রে আগ্রহ সামলিয়ে সে কাজগুলো যথাসময়ে করার জন্য রেখে দিয়ে পূর্বপরিকল্পিত কাজটি করে নেয়াটাই উচিত। তবে অতীব জরুরী কাজের কথা ভিন্ন।

চ. কাজের সময়সূচি সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট হওয়া :

প্রতিটি কাজের সময়সূচি লিখিত ভাবে থাকাটাই উত্তম। পড়া কিংবা কাজটি শুরু কয়টায়? শেষ কয়টায়? সব লিখা থাকতে হবে। সর্বোচ্চ

চেষ্টা করতে হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেন কাজটি অবশ্যই শেষ করা যায়।

ছ. শেষ সময়ের জন্য কাজ রেখে না দেওয়া :

একেবারে প্রান্তিক সময়ে কোন কাজ করার জন্য রেখে দেয়া ঠিক নয়। কারণ: তখন কাজটি করার সুযোগ নাও পাওয়া যেতে পারে। এর চেয়ে অতীব জরুরী কাজের ব্যস্ততা এসে যেতে পারে। আবার সময় পাওয়া গেলেও তাড়াহুড়ার কারণে নানা ধরণের ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। যেমন ধরুন; ৩টায় ট্রেন ছাড়ার সময়। আপনার পরিকল্পনা হল: ব্যাগ গোছাবেন ২.৩০-২.৪৫ পর্যন্ত। ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন ২.৪৫ মিনিটে। এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করলে এটা খুবই সম্ভাবনা থেকে যাবে যে আপনি তাড়াহুড়া করে ব্যাগ গোছাতে গিয়ে নিজের পায়জামার পরিবর্তে ছোট ভাইয়ের পায়জামাটাই হয়তো আপনার ব্যাগে অনায়াসে ঢুকিয়ে নিতে পারেন। যা আপনাকে পরবর্তীতে চরম ভোগান্তিতে ফেলে দিতে পারে।

এটা ইসলামের শিক্ষা নয়। বরং ইসলাম শিখিয়েছে, এমন সময়ে ফজরের সালাত আদায় কর যেন কোন ক্রমে সালাত ভঙ্গ হয়ে গেলে সূর্যোদয়ের পূর্বে পূনরায় যেন যথাযথভাবে আবারও সালাত আদায় করে নেয়া যায়।

অতএব, প্রান্তিক সময়ের জন্য কাজ হাতে না রেখে এখনই করে নেয়া উত্তম।

জ. একসাথে অনেক কাজ করার চেষ্টা করা :

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল ঢিলেঢালা কিংবা অকর্মা হতে পারে না। তাকে অবশ্যই অনেক কাজ করতে হবে। এক কাজের দোহাই দিয়ে অন্য কাজকে পিছে ফেলে রাখা বা না করা, আর যেই হোক ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল এমন করতে পারে না। কাজেই এক সাথে অনেক কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। গাড়িতে বসে

প্রয়োজনীয় ফোন করার কাজটা সেরে নেয়া যেতে পারে। ক্লাসে স্যার আসতে দেরী হচ্ছে কিংবা আসবেন না, এই সুযোগে সংগঠনের প্রয়োজনীয় লেখাটা লিখে নেয়া যায়। একই সাথে নিজে কাজ করা, অন্যান্য দায়িত্বশীলদের কাজ বুঝিয়ে দেয়া ও বাকিদের তদারকী করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

ঝ. সময় ব্যবস্থাপনার আরো কিছু কৌশল :

● কারো সাথে দেখা করতে যেতে চাইলে আগে টেলিফোনে কিংবা অন্য কোন মাধ্যমে তার উপস্থিতি নিশ্চিত করে তবে যেতে হবে। কারণ তাকে না পেলে আপনার সময়টা অপচয় হবে।

● সব সময় কাগজ কলম বা ছোট নোট বুক সাথে রাখবেন। কোন কাজের তালিকা মনে হওয়া মাত্রই যেন লিখে নেয়া যায়।

● দূরে যেতে হলে সম্ভাব্য সময়ের চেয়ে বেশি সময় হাতে রাখবেন। কারণ পথে জ্যাম কিংবা অনাকাঙ্খিত কিছু ঘটলেও সময় মত যেন যথাস্থানে পৌঁছা যায়।

● আপনার সময় ক্ষেপন হতে পারে এমন চিন্তাশূণ্য, আত্মকেন্দ্রিক লোক এড়িয়ে চলা ভাল। তবে বড়দের কাছে গেলেও অনেক সময় কালক্ষেপণ হতে পারে, এখানে উল্লেখিত বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

● চিঠি বা টেলিফোনে সেরে নেয়া যায় এমন কাজের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে না যাওয়াই ভাল। তবে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে, দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে, বড়দের ক্ষেত্রে কেবল টেলিফোনে সেরে নেয়ার চিন্তা করা যাবে না।

● রাস্তায় চলতে রিক্সা ভাড়া, বাস ভাড়া ইত্যাদির জন্য সব সময় কাছে খুচরা টাকা রাখবেন। যেন খুচরা করতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট না হয়।

● কারো সাথে সাক্ষাত করে কথা বলতে চাইলে পূর্বেই সময় নিয়ে নিবেন এবং কত সময় কথা বলবেন তাও জানিয়ে নিবেন।

৮. প্রেরণা সৃষ্টির যোগ্যতা :

যেকোন কাজের জন্য মানুষকে পিছন থেকে যে জিনিসটি উদ্বুদ্ধ করে, মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় তাকে বলা হয় 'প্রেষণা'। আমরা যাকে বলি প্রেরণা। এটি অনেক কিছুর মাধ্যমেই হতে পারে। যেমনঃ শ্রমিক হাড়ভাঙ্গা কষ্ট শিকার করে, চাকুরিজীবি চাকুরি করে, ব্যবসায়ী ব্যবসা করে, পিছনে প্রেরণা হল শ্রম শেষে অর্থ পাবে। মানুষ মহান আল্লাহর ইবাদত করে অল্লাহ তা'য়ালা তার উপর সন্তুষ্ট হবেন, পরকালে সে উত্তম প্রতিদান পাবে, এটিই তাঁর প্রেষণা বা প্রেরণা। ঠিক একই ভাবে যারা ইসলামী আন্দোলন করে তারা রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরামের মত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি, ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য করে। হিজরতের পূর্বে মদিনাবাসী সাহাবায়ে কেরামের একটি দল রাসূল সা. কে মদিনায় হিজরতের জন্য আহবান জানালে রাসূল সা. তাদেরকে বললেনঃ আমাকে যদি তোমরা মদিনায় আশ্রয় দেও তাহলে তোমাদেরকে হত্যা ও চরম নির্যাতন করা হতে পারে। তোমরা কি তারপরও আমাকে আশ্রয় দিবে? সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ এসব নির্যাতন সহ্য করলে এর বিনিময়ে আমাদেরকে কি দেয়া হবে? রাসূল সা. বললেন مَنْ يُؤوِيْنِيْ وَيَنْصُرُنِيْ حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَاتِ رَبِّيْ وَلَهُ الْجَنَّةُ অর্থাৎ-আমার রবের রেছালাত পৌঁছানের ক্ষেত্রে যে আমাকে আশ্রয় দিবে এবং সহযোগিতা করবে এর বিনিময়ে তাদেরকে পরকালে জান্নাত দেয়া হবে।

সাহাবায়ে কেরাম রা. এক বাক্যে বলে উঠলেনঃ আমাদেরকে জান্নাত দেয়া হবে! আপনি নির্দ্বিধায় চলে আসুন। আমরা জান্নাতের বিনিময়ে সব কিছু কুরবানী করতে রাজি আছি। পরকালে জান্নাত প্রাপ্তিই হল সাহাবায়ে কেরামের ইসলামী আন্দোলনের পথে জীবন দেয়ার জন্য প্রেরণা।

কাজেই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সা. সন্তুষ্টি অর্জন, মহান রবের খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করে সৃষ্টির সেবা করার মহান দায়িত্ববোধকে যেন কোন ধরণের হতাশা, নিরাশা, পিছুটান, দুনিয়া মোহ, ব্যক্তিগত স্বার্থ ইসলামী আন্দোলনের কাউকে গ্রাস করতে না পারে, কাউকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে না পারে, এ পথ থেকে দূরে ঠেলে দিতে না পারে সে দিকে দায়িত্বশীলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক জীবনে মানুষ নানা কারণে হতাশ হয়। তাই বলে কেউ পরিবার ও সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। ঠিক একই ভাবে সাংগঠনিক জীবনেও নানা কারণেই হতাশাজনক অনেক কিছু ঘটতে পারে তাই বলে একজন মুমিন, ইসলামী আন্দোলনের একজন দায়িত্বশীল কখনই হতাশ হতে পারে না। কারণ, কুরআন-হাদিস আগেই জানিয়ে দিয়েছে এ পথে দুনিয়াবী সাফল্যের চেয়ে বিপদ আপদ ও বাধা বিপত্তির জন্য বেশি প্রস্তুত থাকতে হয়। প্রশংসা ও ধন্যবাদের চেয়ে নিন্দা ও সমালোচনার জন্য বেশি প্রস্তুত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

দায়িত্বশীলের কাজ কেবল এতটুকুর মধ্যেই শেষ নয় যে নিজে হতাশ হবে না বরং পাহাড়সম প্রতিকূলতার মধ্যে সে নিজেও যেমন অটল অবিচল থাকবে সাথে সাথে অন্যান্যদেরকেও হতাশার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত রেখে দীনের এ মহান পথে অটল অবিচল রাখতে হবে। কেননা আগেই বলেছিঃ হতাশা ইসলামী আন্দোলন তথা সফলতার পথে কেবল চরম বাঁধাই নয়, ক্যান্সার তুল্যও বটে।

কাফের মুশরিকদের পক্ষ থেকে অসহনীয় নির্যাতন সত্ত্বেও রাসূল সা. যেন দীনের মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ন্যূন্যতম বিচলিত না হন এবং তাকে সান্তনা দেয়ার জন্য এ জাহানের মহান প্রতিপালক ঘোষণা করেনঃ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ অর্থাৎ- অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবেন না। ওদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হত, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা সুস্পষ্ট অবগতি। এখন তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যারা পাপাচারী সম্প্রদায়। (সূরা আহক্বফ: ৩৫)
فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ অর্থাৎ- হে নবী আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন তার উপর আপনি এবং আপনার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই অটল অবিচল থাকুন। সীমা লংঘন করবেন না। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। তাহলে তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আল্লাহ ব্যাতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই। ফলে কোথাও সাহায্যও পাবে না। (সূরা হুদ: ১১২-১১৩)

৯. কর্মীদের মাঝে ইনসাফ কায়েম করা :

ইসলামী আন্দোলন করার উদ্দেশ্যই হল মহান রবের এ পৃথিবীর সর্বত্র ইনসাফ কায়েম করা। সেক্ষেত্রে দায়িত্বশীলকে প্রথমে নিজের আশপাশের যারা তাদের প্রতি ইনসাফ কায়েম করতে হবে। যাদেরকে নিয়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে তাদের মাঝেই যদি ইনসাফ কায়েম করা না যায় তাহলে গোটা উম্মতের মাঝে কিভাবে তা কায়েম করতে সক্ষম হবে? কাজেই দায়িত্বশীলকে এ ব্যাপারে অবশ্যই যত্নবান হতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

ক. সংগঠনের নীতিমালা বা নিয়ম-কানুন যথাযথ অনুসরণ করা :

কর্মীদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার প্রধান শর্তই হল সংগঠনের নীতিমালা বা নিয়ম কানুন যথাযথ অনুসরণ করা। সংগঠনের

নীতিমালাকে পিছনে ঠেলে দিলে সেখানে ইনসাফহীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও বিশৃঙ্খলা অনেকটাই অবশ্যম্ভাবী। কারণ সংগঠনের নীতিমালা বা নিয়ম-কানুন করা হয় পরামর্শের ভিত্তিতে। এ কারণে এর মধ্যেই আল্লাহ পাকের রহমত পূর্ণ থাকে। এর বাইরে গেলেই সেটি হবে রহমতশূন্য। শত ভাল মনে হলেও বিশৃঙ্খলা থাকবে তার পদে পদে। আর একটি বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দিলে আরো দশটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। কাজেই নীতিমালা বা নিয়ম বহির্ভূত কোন কিছু কোনভাবেই প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

খ. ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করা :

কর্মীদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে হলে দায়িত্বশীলের সকল কাজ অবশ্যই ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে। ছোট মুখে বড় কথা আবার বড় হয়ে ছোটদের মত কথা বলা কিংবা আচরণ করা সংগঠনের শৃঙ্খলা ও ভাবমূর্তির জন্য চরম ক্ষতিকর। অনেক সময় অতি অল্পদিনে অনেকে বড় দায়িত্বে চলে এলে নিজেকে সামলে নিতে পারে না। এছাড়াও নানা কারণে এমন ভারসাম্যহীন আচরণ করতে পারে। যেভাবেই হোক না কেন এটা ইসলামী আন্দোলনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কথা-বার্তা, চাল-চলন, আবেগ-অনুভূতি, রাগ, ভালোবাসা, রূঢ়তা, শ্রদ্ধা ও স্নেহবোধ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। আবেগে উদ্বেলিত হয়ে, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দায়িত্বশীল কোন কাজ করতে পারেনা। কর্মীদের দিকে তাকানোর ক্ষেত্রেও এমন ভাবে তাকাতে হবে যেন কেউ এমন মনে করতে না পারে যে আমার অধিকার থাকা সত্ত্বেও অন্যকে আমার উপর প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। আমাদের প্রিয় নবী সা. এজন্যই যখন কারো দিকে তাকাতেন তখন পূর্ণভাবে তাকাতেন, পুরোপুরিভাবে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেন। চোখের কোনা দিয়ে তাকাতেন না। কেউ কথা বললে অন্যমনস্ক না হয়ে বরং পূর্ণ মনোযোগের সাথে তার কথা শুনতেন। ফলে সকলেই ধারণা করতেন

রাসূল সা. তাকেই বোধহয় সবচেয়ে অধিক ভালবাসতেন। (শামায়েলে তিরমিযি)

খ. সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা যথার্থ হওয়া :

কাজের ক্ষেত্রে অধঃস্তনদেরকে নির্দেশ দেয়ার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

১. শুধু কি অন্যকেই কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন নাকি নিজেও কাজ করেন?

২. যথাযোগ্য ব্যক্তিকেই কাজের নির্দেশ দিতে হবে।

৩. যারা সবসময় কাজ করে কেবল তাদেরকেই কাজ না দিয়ে বরং সব দায়িত্বশীলকেই কাজে লাগাতে হবে। এমন যেন না হয় যে কিছু লোককে দিয়ে সব সময় কাজ করানো হয় আর অন্যরা শুধু বসে বসে নির্দেশ কিংবা পরামর্শ দেন।

৪. যাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তার পক্ষে কাজটি আদৌ করা সম্ভব কিনা? বুঝিয়ে দিলেও সে করতে পারবে কি না? তা বুঝে তারপর নির্দেশ দিতে হবে।

৫. নতুনদেরকে কাজ শিখানোর জন্য কোন কাজ দিলে নির্দেশ দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। প্রথমে কাজটি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, পরবর্তীতে মুহূর্তে মুহূর্তে খোঁজ নিতে হবে সে কাজটি করতে পারছে কিনা? না পারলে তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে তার মাধ্যমেই কাজটি করিয়ে নিতে হবে। তবে সে পারছে না বলে নিজে করে দেয়া যাবে না। কারণ তাহলে সে কোন দিনই কাজ শিখবে না। হ্যাঁ, যদি সে একান্ত অক্ষমই হয়ে যায় তাহলে করে দেয়া যেতে পারে, অন্যথায় নয়।

গ. প্রটোকল রক্ষা করা :

প্রচলিত অর্থে ব্যাপকভাবে না হলেও সাংগঠনিক কার্যক্রমের শৃঙ্খলার জন্য সাংগঠনিক প্রটোকলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যাকে যতটুকু শ্রদ্ধা করা,

মর্যাদা দেয়া প্রয়োজন, যার সাথে যেভাবে আচরণ করা প্রয়োজন তার সাথে ঠিক সে ভাবেই করতে হবে। রাসূল সা. এরশাদ করেছেন: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا অর্থাৎ যে ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং বড়দেরকে শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (তিরমিযি, আবু দাউদ)

কাজেই চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে সাংগঠনিকভাবে বড়দেরকে প্রাধান্য দিতে হবে। সুবিধা-অসুবিধায় উর্ধ্বতন যার সাথে যোগাযোগ কিংবা কথা বলা প্রয়োজন ঠিক তার সাথেই কথা বলা কিংবা যোগাযোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংগঠনের প্রচলিত নিয়মকে অনুকরণ করা বাঞ্চনীয়। রাসূলে পাক সা. এর দরবারে হযরত আবুবকর ও ওমর রা. এর উপস্থিতিতে অন্যান্য সাহাবাগণ কমই কথা বলতেন। চলতে ফিরতে তাঁরা দুজনই সাধারণত রাসূল সা. এর ডানে বামে থাকতেন। বৈঠকে তাঁরাই অধিকাংশ সময় তাঁর ডানে বামে বসতেন। অধিকাংশ সময় রাসূল সা. এদের দু'জনের সাথেই বিশেষ পরামর্শ করতেন। রাসূলের সা. ইন্তেকালের পূর্বে ইমামতির জন্য হযরত আবু বকর রা. কেই পাঠিয়েছিলেন। তাইতো তার ইন্তিকালের পর খিলাফতের দায়িত্ব প্রদানের সময় হযরত আব্বাস রা. বলেছিলেন হযরত আবু বকরের কদমের সামনে কে কদম বাড়াবে? যাকে স্বয়ং রাসূল সা. কদম বাড়িয়ে সামনে গিয়ে সালাতের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ঘ. স্বজনপ্রীতি না করা :

ইসলাম স্বজনপ্রীতিকে মেনে নেয় না। তবে যোগ্য ব্যক্তির হক, আত্মীয়ের হক ইত্যাদিকে যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। দায়িত্বপ্রদান, দায়িত্ব থেকে বিরত রাখা, কোন কিছু বন্টন করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি কোন ক্রমেই বরদাশত যোগ্য নয়। এটা সাংগঠনিক শৃঙ্খলার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক। স্বজনপ্রীতির মোকাবেলায় রাসূল সা. বলেছিলেন: لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا অর্থাৎ-যদি

মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করে তাহলেও আমি তার হাত কর্তন করব। (নাসাঈ শরীফ)
তবে এটাও মনে রাখতে হবে, যথাযোগ্য ব্যক্তিকে যথার্থ মূল্যায়ন করাকে স্বজনপ্রীতি বলা হয় না।

১০. ইসলামী আন্দোলনে সর্বোচ্চ কুরবানীর মানসিকতা রাখা :
ক. সর্বোচ্চ কুরবানীর মানসিকতা : সকল কাজে দায়িত্বশীলকে প্রথমেই সর্বোচ্চ কুরবানীর মানসিকতা রাখতে হবে। তার কুরবানীর দৃষ্টান্ত দেখে অধঃস্তনরাতো বটেই উর্ধ্বতনরাও যেন প্রেরণা পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে জনৈক সাহাবী এসে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ক্ষুধার তাড়না এতটাই প্রকট হয়েছে যে সহ্য করতে না পেরে ইতোমধ্যেই পেটে একটি পাথর বাধতে হয়েছে। কোথাও কোন খাবারের জোগাড় হবে কি ইয়া রাসূলাল্লাহ? রাসূল সা. উত্তর দিলেন আমার দিকে তাকাও, আমি ইতোমধ্যে আমার পেটে দুটো পাথর বেঁধেছি। দেখে উক্ত সাহাবী লজ্জিত হলেন এবং তাঁর কাজের স্পৃহা আরো কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেল।

খ. ইসলামী আন্দোলনকে প্রাধান্য দেয়া :
ইসলামী আন্দোলনের কেবল দায়িত্বশীল নয় প্রতিটি মুসলমানের জন্যই দীনের সকল কাজকে ব্যক্তিগত সকল কাজের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। আজকে দুনিয়ার মধ্যে ইসলামের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হল: মুসলমানরা আজ ইহকালীন শান-শওকত, আরাম আয়েশের জন্য ব্যক্তিগত ব্যবসা বাণিজ্যকেই তাদের মূল এবং প্রধান কাজ হিসেবে বানিয়ে নিয়েছে। এমনকি যারা আজ ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত তাদের অধিকাংশই ব্যক্তিগত কাজের উপর ইসলামী আন্দোলনের কাজকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম হননি।

বলা হয়ে থাকে সাহাবায়ে কেরাম যদি বর্তমান যামানার মুসলমানদেরকে দেখতেন তবে আমাদেরকে কাফের কিংবা এর কাছাকাছি অন্য কিছু বলতেন আর আমরা তাদেরকে দেখলে হয়ত পাগল বলতাম। কারণ কি? কারণ বলার আগে আরেকটি কথা বলা দরকার। তাহল: কেউ যদি তার মূল লক্ষ্যের উল্টো পথে চলে তবে তাকে অবশ্যই আমরা পাগল বলে থাকি। যেমন কেউ বাংলাদেশে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে চায়, অথচ সে রাজশাহীর বাসে টিকিট কেটে দিব্বি আরামে বসে রয়েছে। বাস ছেড়েও দিয়েছে। পাশের ছিটের লোকটি জিজ্ঞাসা করল ভাই কোথায় নামবেন? কেন, চট্টগ্রাম বাসষ্ট্যান্ডে! লোকটি বলবে ভাই আপনি কি আমার সাথে মশকরা করছেন? না আমি সত্যিই বলছি। তখন লোকটি বলবে আপনিতো আসলেই পাগল হয়েছেন। আপনি রাজশাহীর বাসে চড়ে উল্টোপথে চট্টগ্রাম যেতে চান!

বান্দার প্রধান এবং প্রথম কাজ হল পরোকালে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে সে পথে চলা। দীন বিজয়ের জন্য সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় সর্বদা সেই ফিকিরে থাকা। অথচ মুসলমান আজ পরকালের ভাবনাকে পিছনে ফেলে দুনিয়ার ভোগ বিলাসের তালাশেই সদা ব্যাস্ত।

সাহাবায়ে কেরামকে যদি জিজ্ঞাসা করা হত সারা দিন কিভাবে অতিবাহিত করেন তারা উত্তর দিতেন সারাক্ষণ রাসূল সা. এর দরবারে থাকি। জিহাদ, দা'ওয়াত, তা'লীম ইত্যাদি কাজেই মশগুল থাকতে হয়। তবে সময়-সুযোগ পেলে বাগান ক্ষেত-খামারে কিছু সময় ব্যয় করি।

অপর দিকে বর্তমানে এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের সদস্য কর্মীদের জিজ্ঞাসা করলে তারা সাহাবায়ে কেরামের ঠিক উল্টো উত্তর দিয়ে থাকে। তারা খুব উৎসাহের সাথেই বলে থাকে: আমরা ব্যক্তিগত ব্যাবসা-বাণিজ্য, চাকুরি, লেখা পড়ার পর বাকি সময়টুকু ইসলামী আন্দোলনে ব্যয় করি!

সাহাবায়ে কেরামের প্রথম কাজ হল রাসূল সা. এর নির্দেশনা অনুসণ করা, অনুমতি ও সুযোগ হলে ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করা দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। আর আমাদের ক্ষেত্রে প্রথমে ব্যাক্তিগত কাজ সম্পন্ন করার পর সুযোগ হলে দীনের দায়িত্ব পালন করা। এটাই হল তাদের সাথে আমাদের মৌলিক পার্থক্য।
সাহাবায়ে কেরামের কার্যক্রমের ঠিক উল্টো পথে চলার কারণেই তারা আমাদেরকে দেখলে হয়ত কাফের বলতেন আর আমরা তাদেরকে দেখলে কাফের বলতাম।

কাজেই দীন বিজয়ের সকল দায়িত্বশীলকে সকল কাজের উপর ইসলামী আন্দোলনের কাজকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে।

গ. সংগঠনের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেয়া :
দায়িত্বশীলকে ব্যক্তিগত সকল সিদ্ধান্তের উপর সংগঠনের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিতে হবে। সাহাবায়ে কেরামতো তাদের সকল সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা রাসূল সা. এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কাজেই সংগঠনের সিদ্ধান্তের সাথে কখনও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের সাংঘর্ষিকতা দেখা দিলে বিনা বাক্যে সংগঠনকে প্রাধান্য দিতে হবে। ব্যক্তিগত সকল প্রয়োজনীয়তা আর দীন বিজয়ের আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা একত্রিত হলে চেষ্টা করতে হবে উভয় প্রয়োজনীয়তাই যেন পূরণ করা যায়। যদি এটা সম্ভম না হয় তবে অবশ্যই ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা পূরণে দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করতে হবে।

ঘ. সংগঠনের সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ :
ইসলামী সংগঠনের সকল সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয় ইসলাম নির্দেশিত পদ্ধতিতে। কাজেই যতক্ষন পর্যন্ত ইসলাম বিরোধী কোন কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করা হবে ততক্ষন পর্যন্ত সংগঠনের সিদ্ধান্ত অকপটে মেনে

নিয়ে তা অনুসরণ করা প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব। বুঝে আসুক বা না আসুক, আমার ব্যাক্তিগত যত ক্ষতিই হোক না কেন কোন ধরনের আপত্তি তোলার কোন অধিকার ইসলাম কাউকেই দেয়নি। কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
অর্থাৎ-হে মুমিনেরা তোমরা মহান আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তোমাদের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যাক্তিদের অনুসরণ কর। (সূরা নিসা: ৫৯)
রাসূল সা. ইরশাদ করেন: عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَ مَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَ مَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَ مَنْ يَعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ وَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِه وَ يُتَّقَى بِه (صحيح البخاري)

অর্থাৎ- হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,রাসূল স. বলেছেন: যে আমাকে অনুসরণ করবে সে যেন মহান আল্লাহকে অনুসরণ করল আর যে আমার অবাধ্যতা করল সে যেন আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। যে ইসলামী আন্দোলনের আমীরের অনুসরণ করবে সে যেন আমার অনুসরণ করল আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল সে যেন আমারই অবাধ্যতা করল। ইমাম বা নেতা হলেন ঢাল স্বরূপ। তার নেতৃত্বে শত্রুর সাথে লড়াই করা হয় এবং তারই পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : بَايَعْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فِيْ الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ وَ الْمُكْرَه وَ الْمَنْشِطِ وَ عَلَى أَثْرَةٍ عَلَيْنَا وَ أَنْ لَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَه وَ أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِيْ اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ .

অর্থাৎ-হযরত উবাদা বিন ছমেত রা. বলেন, আমরা নিম্নোক্ত কাজ গুলোর ব্যাপারে রাসূল সা. এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলাম। ১. নেতার কথা শুনব এবং অনুসরণ করব দুঃসময় কিংবা সুসময় যখনই হোক না কেন? পছন্দের কিংবা অপছন্দের যেমনই হোক না কেন? ২. নিজের সুযোগ সুবিধার উপর অন্যকে প্রাধান্য দিব। ৩. আমরা নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তির সাথে বিতর্ক করব না। ৪. সদা সত্য বলব যেখানেই থাকি না কেন, আল্লাহর পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না। (সীরাতে ইবনে হিব্বান, ১ম খন্ড, পৃ:১১৮)

কাজেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা, লবিং করা, গ্রুপিং করা, দল পাকানো ইত্যাদি সম্পূর্ণ হারাম। কুরআন সুন্নাহ লঙ্ঘনেরই শামীল। ইসলামী রাষ্ট্রে এমন ব্যক্তিকে বাগি বলা হয়। ক্বাজী তাকে কতলের হুকুমও দিতে পারেন। হ্যাঁ, তবে সিদ্ধান্তের পূর্বে যথাযথ পদ্ধতিতে পরামর্শের সুযোগতো অবশ্যই রয়েছে।

॥ সমাপ্ত ॥